আকাশ
ও
পৃথিবী
দেবদাস দাশগুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক সাধারণ পাঠাগার ও সমাজশিক্ষা কেন্দ্রের জন্য নির্বাচিত

আকাশ ও পৃথিবী

[ছোটদের বিজ্ঞান সাহিত্য]

রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত

দেবদাস দাশগুপ্ত

পরিবেশক
সাহিত্য প্রকাশ
৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

AKASH-O-PRITHIVI—THE SKY AND THE EARTH : by *Debdas Dasgupta* : The Story of the Creation from Nebula to Neolithic Man : A juvenile Scientific literature receiving National Award.

(সেন্ট্রাল) প্রথম প্রকাশ :
বৈশাখ—১৩৮০, April—1973
তৃতীয় মুদ্রণ :
ভাদ্র—১৩৮৫, August—1978

প্রচ্ছদ—সব্যসাচী দাশগুপ্ত
অন্য ছবি—ত্রিদিব কুমার দাশগুপ্ত

মূল্য : বার টাকা
Price : Rupees Twelve only

প্রকাশক :
সুধীরচন্দ্র রায়
সেন্ট্রাল লাইব্রেরী
১৫/৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১৩

মুদ্রাকর :
শ্রীহরিনারায়ণ দে
শ্রীগোপাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৫/১এ, কালিদাস সিংহ লেন,
কলিকাতা-৯

আমার

মা-বাবাকে

নিবেদন

দীর্ঘদিন 'আকাশ ও পৃথিবী' ছাপা ছিল না। সর্বশেষ সংস্করণ, সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীর দ্বিতীয় মুদ্রণ নিঃশেষে ফুরিয়ে গিয়েছিল। বহু সহৃদয় পাঠক বইখানা খুঁজেছেন, কিন্তু পাননি। এজন্য আমরা দুঃখীত ও লজ্জিত।

সুহৃদবর শ্রীসুধীর চন্দ্র রায়ের উদ্যোগে বইখানি আবার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হ'ল। বর্তমান বাংলা সাহিত্যের বাজারে যে প্রকাশক ছোটদের বিজ্ঞান-সাহিত্য প্রকাশ করবার জন্য অর্থ ব্যয় করতে সাহসী হন, অবশ্যই তিনি শ্লাঘনীয়। কারণ, তাঁর এই প্রচেষ্টার পেছনে অর্থ-প্রীতির চাইতে আদর্শ-প্রীতিই প্রকট হয়ে ওঠে। ব্যবসাক্ষেত্রে এটা খুব সুলভ নয়।

১৯৫৩ সনে 'আকাশ ও পৃথিবী' প্রথম প্রকাশিত হয়। এবারে তার নবম মুদ্রণ প্রকাশিত হ'ল (সেণ্ট্রালের তৃতীয়)। ১৯৫৬ সনে এর দ্বিতীয় সংস্করণ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পায়। প্রতিটি সংস্করণ বেরুবার আগে বইখানি পরিমার্জিত হয়েছে—এবারও হ'ল।

যাঁদের জন্য লেখা তাঁরা বইখানাকে ভালবেসেছেন, সেটাই আমার বড় পুরস্কার।

বইখানার অলংকরণ করেছেন আমার দুই পুত্র।

বারাসত
চব্বিশ পরগণা
১৫ই আগষ্ট
১৯৭৮

দেবদাস দাশগুপ্ত

পরিচয়

আকাশ ও পৃথিবীব সঙ্গে আমাদের নিত্যকার সম্বন্ধ অথচ এ'দের বিষয়ে আমাদের জ্ঞান কতটুকু? এই দুইটির সম্বন্ধে কথা হ'লেই মনে হয় কি ভয়ানক বিরাট ব্যাপার, কী জটিল রহস্য! এ-ও মনে হয় যে সব শাস্ত্র এই জটিল রহস্যের সমাধান ক'রবার চেষ্টা ক'রেছে, সেগুলি বোধ হয় আরও দুর্বোধ্য, আরও জটিল! অথচ এদের সম্বন্ধে জানবার ঔৎসুক্য ছেলেবুড়ো সবারই পুরোমাত্রায় আছে!

বন্ধুবর দেবদাসবাবু সেই জটিল তথ্যগুলি নিতান্ত সরল ক'রে 'আকাশ ও পৃথিবী' আমাদের সামনে উপস্থিত ক'রেছেন, সহজ সুন্দর কথায়, গল্পের ভঙ্গীতে। ছাত্রজীবন থেকেই জটিলকে সরল ক'রে, অতি পরিচিতের পরিচয় করিয়ে দিয়ে জ্ঞান-বিস্তারের চেষ্টা তাঁর রয়েছে, আর এইটিই তাঁর প্রথম প্রয়াস। সাহিত্যের দিক দিয়ে এই নূতন ভঙ্গীতে লেখা বইটির স্থান উচ্চে। বাংলা ভাষায় ঠিক এমনিভাবে লেখা বই আর চোখে পড়ে না। তাঁকে আর তাঁর 'আকাশ ও পৃথিবী'কে অভিনন্দন জানাই। আশা করি তাঁর এ প্রয়াস সার্থক হবে।

বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র
কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২
১৯৫৩

বিলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শ্রীদেবদাস দাশগুপ্তের 'আকাশ ও পৃথিবী' বইখানি পড়েছি। লেখা খুবই ভাল লেগেছে। রহস্যময় আকাশের আশ্চর্য গল্প তিনি অতি সুন্দর সরল ভাষায় বলেছেন। সকলেই বইখানি পড়ে আনন্দ লাভ করবেন।

—সুখলতা রাও

আকাশ ও পৃথিবী

রাজা নয়, রাণী নয়, রাক্ষস-খোকক্স নয়, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী নয়, ভূতের নয়, বাঘের নয়, এ এক নতুন গল্প—শুনবে ?

এ হচ্ছে তাদের গল্প, যাদের আমরা উঠতে, বসতে, খেতে, শুতে দেখছি—আকাশ, সূর্য, চাঁদ, তারা, মাটি, বন-জঙ্গল, পোকামাকড়, পশু, পাখী, বানর, মানুষ,—এই সব। এদের জন্মকথা, এরা কোথায় ছিল, কি করে এলো, তারপরে কি করে কি হল, সে কথাই বলব তোমাদের। ভারী মজার গল্প—মন দিয়ে শুনো কিন্তু।

তা হলে সুরু করি ?

সে অনেক, অ-নে-ক বছর আগের কথা। এত আগের যে গুণেও শেষ করতে পারবেনা। তখন আকাশে না ছিল সূর্য, না ছিল চাঁদ, না ছিল তারা, আর নিচে না ছিল মাটি, না ছিল পশু-পাখী, গাছ—পালা,—আর আমরা তো ছিলাম-ই না। চারদিক ছিল শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। সেই ঘুটঘুটে কালো আকাশে ধোঁয়ার মত কতগুলো জিনিস ভেসে বেড়াত। ওগুলি কিন্তু মেঘ নয়। ওদের নাম নীহারিকা। এক একটা নীহারিকা আকাশের কতখানি জায়গা নিয়ে যে ঘুরে বেড়াত, তা হিসেব

করে বলা কঠিন। পাতার পরে পাতা শুধু আঁক কষেই যাবে, হিসেব তবু মিলবে না। কাজেই ও চেষ্টা বাদ দেয়া যাক।

রাতের-বেলা আকাশের দিকে তাকালে দেখবে তারায় তারায় আকাশটা ছেয়ে আছে,—কত তারা, কত রকমের, ছোট, বড়, মাঝারি,—যেন আকাশ জুড়ে এক রাশ যুঁই ফুল ফুটে আছে। আর ওরই মাঝে দু-একখানা সাদা কাপড় কে যেন বিছিয়ে দিয়েছে। ঐ যে সাদা জায়গাগুলি, ওর কতগুলি হল নীহারিকা,

কুমোরের চাকার মত বোঁ বোঁ করে ঘোরে

আর কতগুলি হল বহু-দূরের তারার জটলা। এরা এত দূরের যে আমরা এদের চেহারা দেখতে পাই না, চোখে পড়ে শুধু বহু-দূর-হতে-আসা এদের আলোর ঠিকরে-পড়া একটু আভাস মাত্র। এখন, এই যে নীহারিকা, এদের কতগুলি শুধু হালকা মেঘের মত

ঘুরে বেড়ায়, আর কতগুলি কুমোরের চাকার মত বোঁ বোঁ করে ঘোরে। ঘোরে যে, সে কিন্তু বেতাল নয়, প্রত্যেকটাই ঘুরছে একটা কেন্দ্র, মানে, ঠিক মধ্য জায়গায় একটা বিন্দুর চারদিকে। এই ভাবে এরা ঘুরছে, আর এ টানছে ওকে, আর ও টানছে একে,—যে যার নিজের দিকে। এই ঘোরাঘুরি আর টানাটানিতে হল কি, ওদের দেহের বাষ্প বা গ্যাস জায়গায় জায়গায় উঠল ঘন হয়ে। আর যতই হল ঘন, ততই তাদের মধ্যে তাপ সৃষ্টি হতে লাগল। আবার তাপ যতই বাড়তে লাগল—ওরা উঠল চক্ চক্ করে। মানে, ওদের দেহে আলোর সৃষ্টি হল,—আর সেইগুলিই হয়ে উঠল তারা। এমনি করে সেদিনের সেই ঘুট্‌ঘুটে আঁধার আকাশে একটি একটি করে তারার আলো জ্বলে উঠল,—আকাশের দেওয়ালী হল সুরু।

তারা এলো নীহারিকা থেকে। কিন্তু নীহারিকা? ওরা এলো কোথা থেকে? সে কথা আজও কেউ বলতে পারেনি। তবে একথা জেনো, মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির কাছে চিরকাল তা অজানা থাকবে না,—সে খবর মানুষ একদিন জানবেই জানবে। নীহারিকা তো নিজের দেহ বিলিয়ে দিয়ে দিনের পর দিন তারার জন্ম দিয়ে যাচ্ছে,—তারায় তারায় আকাশটা ঝলমল করে উঠছে। এমনি করে একদিন তো নীহারিকা যাবে সব ফুরিয়ে। আর ওদের থেকে ফুটে বেরুল যে তারা, ওরাও তো জ্বলবে না চিরদিন। কারণ,

আগুন যেমন জ্বলে জ্বলে নিভে যায়, ওরাও তেমনি জলে জলে নিভে যাবে একদিন। তবে আগুন জ্বলে পুড়ে রেখে যায় শুধু ছাই, আর তারাগুলি নিভে যায় যখন, তখন থেকে যায় শুধু একটা কালো—কঠিন পিণ্ড। তখন কি হবে? নীহারিকাও নেই, তারাও নেই। আকাশ কি আবার প্রথম দিনের মত অন্ধকারে ছেয়ে যাবে? তারার দেওয়ালী কি আর জ্বলবে না? ভয় পেয়ো না। সৃষ্টির যিনি মালিক, তিনি সব ঠিক করে রেখেছেন। আলো নিভবে না, বিশ্বসংসার মুছে যাবে না। সব ঠিক থাকবে। কি ভাবে—শোনো।

তোমরা জেনেছ নীহারিকাগুলি কি ভাবে এক একটা কেন্দ্র নিয়ে ঘোরে। তারাগুলিও জন্মের প্রথম দিন থেকেই ঘুরতে সুরু করে ওই একই নিয়মে। তারপরে নিভে ঠাণ্ডা হয়ে যাবার পরেও কিন্তু তাদের ঘরপাক খাওয়া থামে না। শুধু ঘোরে আর ঘোরে। এই ভাবে পাক খেতে খেতে দুটো মরা তারা, বা একটা মরা ও একটা জ্যান্ত তারা কখনও কখনও খুব কাছাকাছি এসে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায়, আর এ টানে ওকে, ও টানে একে। সে কী ভীষণ টান! যে তারাটা কাহিল, মানে যার জোর কম, সে বেচারা হুড়মুড় করে এসে পড়ে অন্যটার ঘাড়ে, —আর তখনই হয় একটা ভিষণ ব্যাপার। এই টানাটানি আর ঠোকাঠুকির চোটে এমন তাপের সৃষ্টি

হয় যে, মরা তারাটা গলে যায়। আর গলে গিয়েই হয়ে যায় গ্যাস। কিন্তু তাতেও কি রক্ষা আছে? সেই ঘোরণ-মন্ত্র চেপে বসেছে তার ঘাড়ে। আবার সেই বিরামহীন ঘরপাক। আবার সেই নীহারিকা। এই ভাবেই চলেছে মহাকাশে সৃষ্টির মহাখেলা। এ যে কখনও থামবে, কখনও ফুরিয়ে যাবে, তা ভাবাও যায় না।

———

দুই

তারার কথা

এক-কথায় যাদের তারা বলা হয়—তারা কিন্তু সবাই 'তারা' নয়,—এ কথাটা খেয়াল রেখ। 'তারা' যাদের বলব, তাদের আসল নাম নক্ষত্র। তাই, আকাশে যারা জ্বলছে, তাদের সবগুলিই কিন্তু নক্ষত্র নয়। তার কতগুলি নক্ষত্র, আর কতগুলি হল গ্রহ। একটু নজর দিয়ে আকাশের দিকে তাকালেই দেখবে, কতগুলি তারা মিট্‌মিট্‌ করছে, আর কতগুলি করছেনা। যেগুলি মিট্ মিট্ করছে, সেগুলি হল নক্ষত্র, আর বাকিগুলি গ্রহ। গ্রহদের কথা পরে বলব। এখন নক্ষত্রের কথা শোন।

আকাশে কত নক্ষত্র আছে বলতে পার? পারবে না। কেউ পারে না। খুব পরিষ্কার রাতে ইংলণ্ডের বিজ্ঞানীরা খালি চোখে মাত্র পঁচিশ হাজার নক্ষত্র গুণতে পেরেছিলেন। কিন্তু মানুষের বুদ্ধির সীমা নেই। বুদ্ধির সাথে চলেছে তার ক্লান্তিহীন চেষ্টা। অবশেষে ইটালী দেশের বিজ্ঞানী, গ্যালিলিও আবিষ্কার করলেন এক যন্ত্র আজ থেকে প্রায় চারশ' বছর আগে, ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে। সেই যন্ত্র দিয়ে বহু-দূরের জিনিস খুব বড় করে দেখা যায়। তার নাম দেয়া হল দূরবীন বা দূরবীক্ষণ যন্ত্র, ইংরেজীতে টেলিস্কোপ। এই দূরবীন

বানানোর অপরাধে রাজার আইনে গ্যালিলিওর জেল হয়। সাতজন পুরোহিত ছিলেন বিচারক। কেন, বলি শোনো। তখনকার ইউরোপের ধারণা ছিল পৃথিবী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, আর সূর্য ইত্যাদি সবাই ঘুরছে তার চারদিকে। এ-কথা যাঁরা মানতেন না, দেশের আইনে তাঁরা মহাপাপী। গ্যালিলিও দূরবীন দিয়ে প্রমাণ করলেন,—তাঁদের বিশ্বাস মিথ্যা। সত্য যা, তা ঠিক উল্‌টো, মানে, সূর্য ও প্রতিটি নক্ষত্র স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, আর ঘুরছে যারা, তারা হল গ্রহ-উপগ্রহের দল,—তার মধ্যে পৃথিবী-ও আছে। হলে কি হবে? অজ্ঞানের কাছে বিজ্ঞানকে হার মানতে হল সেদিন।

অথচ দেখ, এরও বহু আগে মস্ত এক পণ্ডিত জন্মেছিলেন পোল্যাণ্ড দেশে, ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে। মহাপণ্ডিত তিনি। নাম কোপার্নিকাস। অনেক আঁক কষে, অনেক হিসেব করে, প্রায় চল্লিশ বছর পরিশ্রমের পরে তিনিই সকলের আগে ইউরোপকে বুঝাতে চেয়েছিলেন ঐ একই কথা, পৃথিবীই ঘোরে, সূর্য নয়। হৈ-চৈ পড়ে গেল ইউরোপে। বলে কি! পাগল না ক্ষ্যাপা? শাস্ত্র বলে সূর্য ঘোরে, আর পাষণ্ড বলে কিনা পৃথিবী! চরম অপমান জুটেছিল সেদিনও তাঁর ভাগ্যে। দুঃখে অপমানে সেই জ্ঞানের পুজারী সেদিন পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। অ-বিদ্যা সেদিনও জয়ী হয়ে ছিল।

জিওরদানো ব্রুণো নামে এক পণ্ডিত পুরোহিত সে সময়ে ইটালীতে বাস করতেন। সত্যের লাঞ্ছনা তাঁর

সহ্য হল না। সমস্ত ভয় তুচ্ছ করে বীরের মত তিনি এগিয়ে এলেন সত্য-সাধক কোপার্নিকাসের সাহায্যে। কোপার্নিকাসের দেয়া যুক্তি তর্কের সাথে আরো যুক্তি-তর্ক জুড়ে তিনি লোককে বুঝাবার চেষ্টা করলেন, বৃথাই তারা একজন মহাপণ্ডিতকে অপমান করছে। তিনি আরও বললেন, শুধু পৃথিবী যে সূর্যের চারদিকে ঘোরে তাই নয়, পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ কিছুটা চাপাও বটে,—কমলা লেবুর মত।

আর যায় কোথা? অ-জ্ঞানের পুরোহিতেরা হত্যা করল জ্ঞানের পুরোহিতকে ধর্মের নামে। ব্রুণোকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হল।

দুঃখ পেয়োনা। চিরকালই অ-বিদ্যার হাতে বিদ্যার লাঞ্ছনা এমনি ভাবেই ঘটেছে। কিন্তু সত্য অনির্বাণ। তার আলো কেউ নিভোতে পারে না।

এরও আগে, অনেক, অনেক আগে। তখনও ইউরোপে জ্ঞানের আলো জ্বলেনি। আমাদের দেশ, ভারতবর্ষ তখন জ্ঞান গরিমায় বহু উঁচুতে। তেমনি সময় আর্যভট্ট নামে এক মহাজ্ঞানী জন্মেছিলেন এদেশে। তিনি বহু গবেষণা করে দেশকে জানালেন সূর্য নয়, ঘোরে পৃথিবী, ঘোরে গ্রহরা আর উপগ্রহরা। নক্ষত্ররা সব স্থির। জ্ঞানের এহেন পূজারী দেশে থাকতেও অবিশ্বাসের হাসি হেসে ছিল তখনকার দেশ। কত যুক্তি-তর্ক উপস্থিত করলেন অবিশ্বাসীরা, কত প্রশ্ন। তাই যদি হবে, তবে সকালে বাসা ছেড়ে পাখীরা

বেরিয়ে সন্ধ্যায় বাসা খুঁজে পায় কি করে? তাতো হারিয়ে যাওয়ার কথা। তাই যদি হবে, তবে আমরা সব ছিট্‌কে পড়ে যাচ্ছি না কেন? কেন তবে দেখি সূর্য পূবে উঠে পশ্চিমে অস্ত যায়? আরো কতো কি। সব যুক্তি মেটালেন আর্যভট্ট, সব তর্ক খণ্ডন করলেন তিনি। কিন্তু শোনে কে? নিদারুণ অপমানিত হয়েছিলেন তিনিও সেইদিন।

তার পরে একদিন দেশকে স্বীকার করতে হয়েছিল তাঁর আবিষ্কারকে।

কিন্তু মজা হল, অত্যাচার কর, আর অপমানই কর, সত্যকে কখনো চেপে রাখা যায় না। আসন সে প্রতিষ্ঠা করবেই একদিন আপন শক্তিতে। মৃত্যুভয়ও তাকে রোধ করতে পারে না। দেরী হতে পারে, কিন্তু তাকে অস্বীকার করবার যো নেই। যতই বড় হবে, ততই দেখবে ইতিহাসের পাতায় পাতায় এর স্বাক্ষর। সর্বকালে, সর্বদেশে, আলোর জন্য গুটিকতক মানুষের কী আকুল কাকুতি, আর তার কণ্ঠ রোধ করবার জন্য অন্ধকারের কি নিষ্ঠুর উৎপীড়ন। সেই কাকুতিইতো একদিন ভাষা পেয়েছিল ভারতের ঋষিদের প্রার্থনায়—

অসতোমা সদগময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়

অ-সত্য হতে সত্যের পথে,
অন্ধকার হতে জ্যোতির পথে
আমাকে নিয়ে চলো।

আর তাইনা, জ্ঞানের যে দীপটি ভারতের আর্যভট্ট জ্বেলেছিলেন একদিন, অনির্বাণ তার শিখা কেমন করে, কোথা দিয়ে দেশকালের সীমানা ডিঙিয়ে, পোল্যাণ্ডের কোপার্নিকাসের হাত থেকে ইটালীর ব্রুনো, ব্রুনো থেকে গ্যালিলিওর হাতে জ্বলে উঠল কি ভাবে। এতকাল যা প্রমাণ হত হিসেব পত্রে আর বই-এর পাতায়, এবার প্রমাণ হল তা চোখের দেখায়।

অসীম আকাশ সীমা হারিয়ে ধরা দিল গ্যালিলিওর দূরবীনের কাঁচে। আলোর হল জয়।

বিজ্ঞান চল্‌ল জোর পায়ে এগিয়ে।

এই দূরবীন আবিষ্কারের পর থেকে আকাশ সম্বন্ধে আমরা এত খবর জেনেছি যা ভাবতেও অবাক লাগে। গ্যালিলিওর পরে মানুষ আরও অনেক শক্তিশালি দূরবীন আবিষ্কার করেছে। সেই দূরবীনের ভেতর দিয়ে সে আজ পনের কোটি নক্ষত্র গুণতে পেরেছে। তবে ভেব না এই শেষ, আকাশে এর বেশী আর নক্ষত্র নেই। আছে,—আরও বহু, বহু কোটি আছে,—যা নাকি আজও দূরবীনে ধরা পড়েনি। হয়তো পড়বে। হয়তো কেন? নিশ্চয়ই পড়বে।

মানুষের চেষ্টার কি শেষ আছে? তার জয়যাত্রা তো এগিয়েই চলেছে।

এই যে অগুণতি নক্ষত্রের দল, এরা মহাশূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে,—প্রত্যেকে প্রত্যেকের বাঁধা পথে, যে পথের বাইরে যাবার সাধ্য নেই তাদের। জ্বলন্ত আগুনের গোলা—দাউ দাউ করে জ্বলছে আর ছুটছে,—ভাবা যায় না সে কথা, মাথা বোঁ বোঁ করে। এদের আকার যে কত বড়, কী ভীষণ, তাও কি ভাবা যায়? শুধু এইটুকু জেনে রেখো, এদের মধ্যে বেশ ছোট আর সবচেয়ে আমাদের কাছে যে,—নাম তার সূর্য। আর তারই দাপটে আমরা অস্থির। কত ছোট আর কত কাছে শুনবে? ১১০টা পৃথিবী পাশাপাশি এক সরল-রেখায় রাখলে সূর্যের এমাথা থেকে ওমাথায় পোঁছন যেতে পারে। আর তার ওজন? পৃথিবীর চেয়ে ৩ লক্ষ ৪০ হাজার গুণ বেশী। আর তিনিই হলেন নক্ষত্রদের মধ্যে শিশু! বোঝ এবার। এর চাইতে কত লক্ষ গুণ বড় নক্ষত্র যে আছে, তা শুনলে হিম্‌সিম্ খেয়ে যাবে। তবুও একটু বলি শোন। সূর্যের ব্যাস, মানে ওর গোল চাকতিটার ঠিক মাঝখান দিয়ে একটা রেখা টেনে হুদিকটা মিলিয়ে দিলে যা হয়, তার মাপ হল ৮ লক্ষ ৬৪ হাজার মাইল। আর 'এ্যাষ্টবেস' নামে একটা নক্ষত্র আছে, তার ব্যাস হল ৩৯ কোটি মাইল। তারপরে সূর্য আমাদের কত কাছে শুনবে? ন' কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল মাত্র। তার মানে, কোন গাড়ী

চেপে ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে যদি তাকে সূর্যের দিকে চালিয়ে দাও আর তিনশ-পঞ্চাশ বছর যদি তোমার পরমায়ু থাকে, তবে হয়তো সূর্যে পেঁাছতে পারবে। কিন্তু কথা হল, সাড়ে-তিনশ' বছর বেঁচে থাকলেও পেঁাছতে পারবে তো ? ন'কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে থেকেও যার সামান্য একটু তেজের দাপটে আমরা অস্থির, তার কাছে আবার পেঁাছন! কাজেই প্রাণ বাঁচাতে চাও তো, ও চেষ্টা বাদ দাও।

অল্প কথায় এই হল নক্ষত্রদের ছোট ভাইয়ের খবর। তারপরে যদি তার ন'দা, সেজদা, মেজদা, বড়দা'দের খবর শোন তবে তো তাজ্জব বনে যাবে। তারা যে আমাদের থেকে কত দূরে, তা তুমি অঙ্কে যত বড় পণ্ডিতই হও,—হিসেব করে কিনারাই পাবে না। তাই মানুষ আকাশের হিসেব-পত্রের ব্যাপারে এক নতুন নিয়ম আবিষ্কার করেছে। হিসেব করে দেখা গেছে যে আলো চলে সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে। একটু থেমে বুঝে নাও। ষাট সেকেণ্ডে হল এক মিনিট, আর ষাট মিনিটে এক ঘণ্টা। ঘড়িটা যে টিক্‌টিক্ শব্দ করছে, তার দুটি শব্দের মাঝখানের সময়টুকুকে বলে এক সেকেণ্ড। আজকাল সবচেয়ে বেগে যে ছোটে, সে হল এক রকম উড়ো জাহাজ। 'জেট প্লেন' বলে তাকে। তার সাধারণ বেগ ঘণ্টায় পাঁচশ মাইলের উপরে। আর সেই তুলনায় আলো ছোটে সেকেণ্ডে, অর্থাৎ, তোমার 'এক'

এই কথাটি বলতে যতটুকু সময় লাগে, তার মধ্যে একলক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল! আবার, তুমি বলছ, আমি শুনছি। তোমার বলা আর আমার শোনার মধ্যে যে কোন ফাঁক থাকতে পারে, এ আমরা বিশ্বাসই করিনে। যেন তোমার মুখ দিয়ে কথা বেরুবার সাথে সাথেই আমার কান তা লুফে নিল। কিন্তু সত্যই কি তাই? শব্দ চলারও একটা গতি আছে, আলোর যেমন। শব্দ চলে সেকেণ্ডে এগারশ' কুড়ি ফুট বেগে। তিন ফুটে এক গজ, আর সতেরশ' ষাট গজে হল এক মাইল। সেই হিসাবে শব্দের গতি দাঁড়ায় সেকেণ্ডে সিকি মাইলের কিছু বেশী মাত্র। এবার বোঝো! কোথায় সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল, আর কোথায় সেকেণ্ডে সিকি মাইলের কাছা-কাছি! এক ঝলক্ বিদ্যুত আকাশটাকে চাবুক মেরে চলে গেল। সাথে সাথে চড়্ চড়্ চড়াৎ। আকাশটা যেন ফেটে পড়ল। এক ছুটে ঘরে পালালে। বাজ পড়ল। ভাবলে, বড় বাঁচা বেঁচে গেলে! কিন্তু সত্যই যদি বাজটা পড়ত তোমার গায়ে বা কাছে-পিঠে, ছুটে পালিয়েও কি বাঁচতে পারতে? কক্ষণো না। ওই শব্দ হওয়ার বহু, বহু-আগেই বাজটা পড়ে গেছে, ভীষণ বিদ্যুত প্রবাহ সেকেণ্ডে সিকি-মাইল-ছোটা খোঁড়া-ঘোড়াটাকে ঢের পেছনে ফেলে। কাজেই বাজ লেগে যে মরল, বাজের শব্দ শোনার ভাগ্য তার আর হল না!

তা হলে বুঝতে পারছ, এক আলো সেকেণ্ড যাকে বলব, তার মানে হল এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। একে আবার ষাট দিয়ে গুণ করলে হল এক আলো মিনিট, তাকে আবার ষাট দিয়ে গুণ করলে হল এক আলো ঘণ্টা। কষে দেখ, শূন্যয় শূন্যয় খাতা ভরে উঠবে। এই হল আকাশের হিসেবপত্তরের কানুন। এখন, এই বেগে ছুটে পৃথিবীতে সূর্যের আলো পেঁছিতে লাগে প্রায় সাড়ে-আট মিনিট। এর পরের নক্ষত্র যে, তার কাছ থেকে আলো আসতে লাগে প্রায় চার বছর। নাম তার আল্‌ফা সেণ্টাউরি [Alpha Centauri]। বড় বিদ্‌ঘুটে নাম। আরও দূরের যারা, তাদের আলো পেঁছিয় বহু-লক্ষ বছর পরে। ব্যাপারটা তাহলে এই দাঁড়াল যে, যে নক্ষত্রকে তুমি আজ দেখছ, হয়তো সে আকাশে আর নেই-ই,—জ্বলে পুড়ে নিভে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে একলক্ষ বছর আগে। সেই লক্ষ বছর আগে যে আলো রওনা হয়েছিল পৃথিবীতে, তাকেই দেখতে পেলে আজ। সম্রাট অশোকের জন্মদিনে হয়ত যে তারাটা জন্মেছিল আকাশে, এই মাত্র পৃথিবীর লোক দেখতে পেল তাকে। ব্যাপার বোঝ!

আকাশের গায়ে নক্ষত্রদের জটলার কথা আগে বলেছি, যাদের বলে ছায়াপথ। নীল আকাশে সাদা কাপড়ের আঁচলবিছানো যেন। ওরা হল নক্ষত্রপুঞ্জ —বহু-কোটি নক্ষত্র বহুদূরে জটলা করে আছে কাছা-কাছি। বহু দূর থেকে তাদের চেহারা দেখতে পাইনে,

দেখি শুধু তাদের আলোর আভা। আমাদের খুব কাছে যে নক্ষত্রপুঞ্জ, নাম তার এ্যাণ্ড্রোমিডা [Andromeda]। নামটা শক্ত হলেও মনে রেখ। তার আলো পেঁছিয় পৃথিবীতে ন' লক্ষ বৎসরে। খুব কাছেই বটে!

তারপর এদের চেহারা। সে নানা রকমের। কেউ বা সূর্যের চাইতে শতগুণ বড়, কেউ বা লক্ষগুণ, কেউ বা আর-ও। তবে এদের এত ছোট দেখি কেন? দূরের জিনিস ছোট দেখায়, কাছের জিনিস বড়, এ তো সোজা কথা। এরা কেউ সূর্যের চাইতে দশ হাজার গুণ বেশী আলো দেয়, কেউ দেয় একশো ভাগ কম। কারুর দেহের গ্যাস খুব ঘন, কারুর বা পাতলা। কেউ চলে একা একা, কেউ বা জোড় বেঁধে। এই জোড়-বাঁধার দল কিন্তু মোট নক্ষত্রদের তিন ভাগের এক ভাগ। এর মধ্যে জোর যার কম, তাকেই ঘুরতে হয় অপরটার চারদিকে,—বেচারা! আবার, দুটোই যদি হয় সমান জোয়ান, তখন তারা নেয় একটা রফা করে। দু'য়ের মাঝামাঝি একটা বিন্দু ঠীক করে দুটোই ঘোরে তার চারদিকে। এই জোড়া-নক্ষত্র জন্মে কি করে জান? নক্ষত্র যতই ঠাণ্ডা হতে থাকে, ততই সে ঘন হয়,—আর বেগ যায় বেড়ে। তারপরে একদিন ভেঙ্গে দুখান হয়ে জোড় বেঁধে চলতে থাকে।

উত্তর আকাশে নীচের দিকে দপ্ দপ্ করে একটা

নক্ষত্র জ্বলছে দেখবে। ও আমাদের বড্ড আপন। নাম ওর ধ্রুবতারা। প্রায় একই জায়গায় দাঁড়িয়ে ও জন্মের প্রথম দিন থেকে আমাদের দিকে চেয়ে আছে। সাতচল্লিশ আলো-বছর দূর থেকে ও যেন অনাদি-কাল ধরে পৃথিবীতে ফেলে-আসা ওর আপনজনকে খুঁজছে। এই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে বলে ও আমাদের বড় কাজে লাগে। আঁধার রাতে ধূ-ধূ-করা মাঠের মাঝে অথবা সমুদ্রের বুকে তুমি দিশেহারা হয়ে পড়েছ। কোন্‌টা কোন দিক, কোন্ দিকেই বা তোমার ঘর, হারিয়ে গেছে সব। এমন সময়
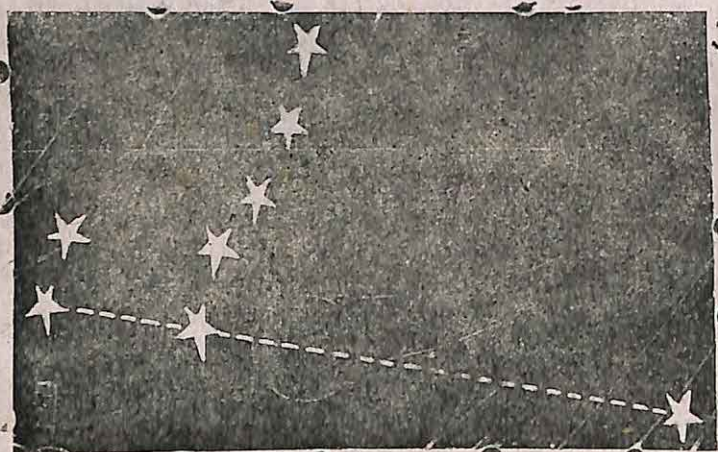
এইভাবেও চিনতে পার ধ্রুবকে

যদি খুঁজে বার করতে পার ধ্রুবকে,—পেয়ে যাবে উত্তর দিক,—পেয়ে যাবে তোমার পথের নিশানা। এরই গায়ে গায়ে আর সাতটি নক্ষত্র আছে। তাদের বলা হয় সপ্তর্ষিমণ্ডল। এদের আলো ধ্রুবের চাইতে

একটু বেশী উজ্জ্বল। চৈত্র-বৈশাখ মাসে আমাদের দেশে এরা সন্ধ্যার পরই উত্তর আকাশে দেখা দেয়। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ে একটু পশ্চিমে হেলতে হেলতে অগ্রহায়ণ মাসে একেবারে নীচে নেমে যায়,—সন্ধ্যাবেলা আর দেখা যায় না। আবার পৌষ থেকে উত্তর-পুব কোণে দেখা দেয়। এই সপ্তর্ষির উপর দিকে যে দুটো নক্ষত্র রয়েছে, একটা রেখা টেনে তাদের যোগ করে দাও। তারপর সেই রেখাটা সোজা উপর দিকে টেনে নিয়ে যাও। দেখবে তোমার রেখা ধ্রুব নক্ষত্রের উপর দিয়ে চলে গেছে।

এই ভাবেও চিনতে পার ধ্রুবকে।

তিন

গ্রহের কথা

আগেই জেনেছ, রাতের আকাশে যারা মিট্‌মিট্ করে না,—লক্ষ্মীছেলেটির মত চুপ্‌টি করে তাকিয়ে থাকে, তারাই হল গ্রহ। গ্রহ ও নক্ষত্রদের মধ্যে তফাৎ অনেক। সে খবরগুলো না জানলে রাতের আকাশে সবগুলিকেই একরকম বলে মনে হবে।

নক্ষত্র হল পিতা, গ্রহ পুত্র। ঠাকুর্দা হল নীহারিকা। মানে, নীহারিকা থেকে জন্ম নক্ষত্রের, আবার নক্ষত্র থেকে গ্রহের।

ছোটবেলা নক্ষত্রগুলি যখন খুব হালকা গ্যাসে ভর্তি ছিল, তখন ঘুরপাক খেতে খেতে ওদের গা' থেকে কিছু কিছু যায় খসে, যেমন কাদা-মাখা মোটরের চাকা থেকে কাদা ছোটে। ছুটে গিয়ে তারা কিন্তু পালাতে পারল না। নক্ষত্রদের টানে খানিক দূরে গিয়েই থামতে হল, আর সুরু হল পিতা-নক্ষত্রের চারদিকে বাঁধা পথে ঘোরা। সেই ঘোরা আজও থামেনি, থামবেও না। নক্ষত্রের কাছ থেকে পাওয়া যেটুকু গ্যাসের পুঁজি নিয়ে গ্রহেরা জন্ম নিয়েছিল, সে তো খুব বেশী নয়। অল্প দিনের মধ্যে সেই গ্যাসের পুঁজি জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে গেল,—আর গ্যাস-পিণ্ডটা ঠাণ্ডা হতে হতে শক্ত হয়ে গেল। নানা ধাতুর তৈরি

ঠাণ্ডা ঘুরন্ত সেই পিণ্ডগুলিই পরে হয়ে দাঁড়াল গ্রহ। এদের নিজেদের কোন আলো নেই,—কারণ এদের দেহের তেজ তো ফুরিয়ে গেছে। তবে ঐ যে ওদের আলো দেখছি, ও কিসের? ও তো ওদের নিজের নয়,—সব ধার করা,—পিতা নক্ষত্রের গা হতে ঠিক্‌রে-পড়া আলো।

প্রত্যেক নক্ষত্রেরই নিজ নিজ গ্রহ আছে। তাই নিয়েই তাদের সংসার। বাপ যেমন ছেলেপুলে নিয়ে ঘর-সংসার করেন—তেমনি। কোনো নক্ষত্রের গ্রহের সংখ্যা বেশী—কারুর বা কম। সব নক্ষত্রের গ্রহদের সংবাদ এখনও ঠিক জানা যায়নি। তবে যার ঘরকন্নার খবর খানিকটা ঠিকভাবে জানা গেছে, তার কথা বলি।

সে হচ্ছে সৌরজগৎ, মানে সূর্যের সংসার। বিজ্ঞানীরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এর খবর যোগাড় করেছেন।

সূর্যকে মধ্যে রেখে নয়টি গ্রহ ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রত্যেকের পথ আলাদা, প্রত্যেকের পথ বাঁধা, কারুর সাথে কারুর ধাক্‌কা লাগার যো নেই। আর তারা ঘুরছে পশ্চিম থেকে পুবে। যে গ্রহ সূর্যের যত কাছে, তার দৌড়ের বেগ তত বেশী। কারণ, সূর্য চাইছে তার পালিয়ে-যাওয়া ছেলেদের কোলে টেনে নিতে, আর ছেলেরা পিতার ঐ রুদ্র-মূর্তি দেখে ভয়ে দে-দৌড়! তাই, কেবলি চলেছে এই ধরবার আর পালাবার খেলা। এদের মধ্যে যার অবস্থা সবচেয়ে

বেশী কাহিল, সে হল বুধ। সে সূর্যের সব-কাছে।
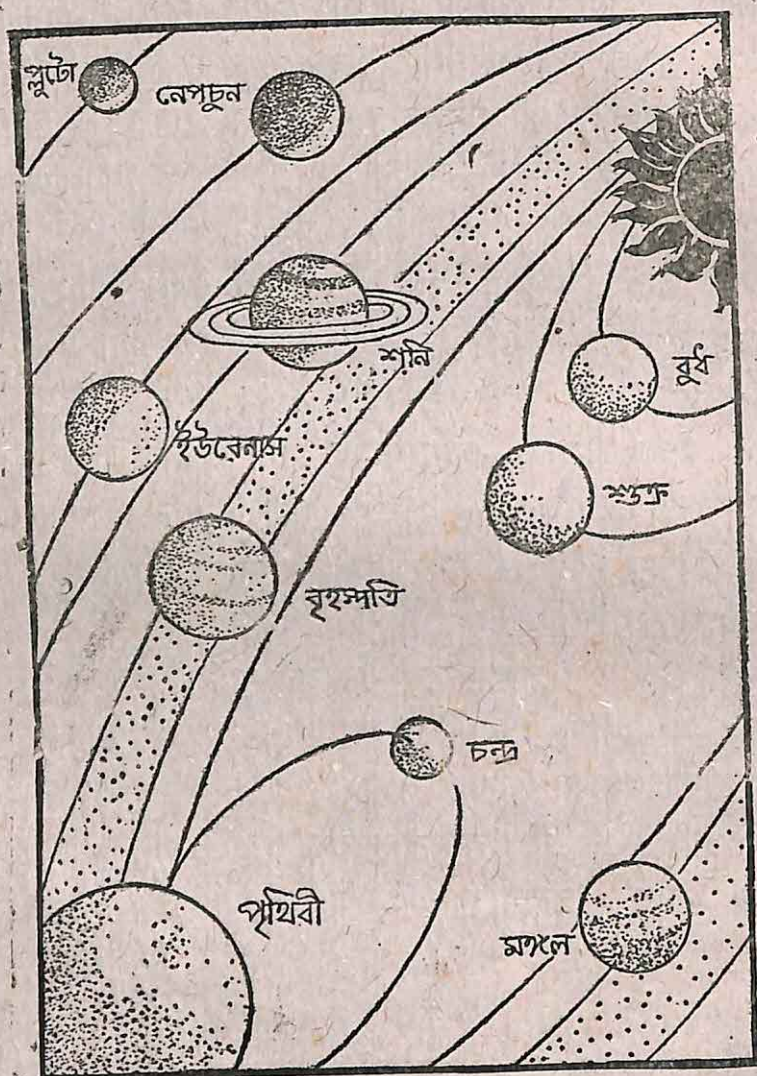
সূর্যের সংসার

ছুটে পালাতে পারেনি বেশী দূর। আটকে পড়েছে সূর্যের টানে। টানের চোটে একবার মুখও ফেরাতে

পারেনা অন্য গ্রহদের মত। তাই ওর একটা পিঠ চিরদিন সূর্যের দিকে ফেরানো থাকে। পুড়ে ছাই হয়ে গেল সেদিকটা। অপর দিকটায় চির-অন্ধকার। সূর্যের একেবারে কাছে বলেই ওর দৌড়ের পাল্লাটাও সব চাইতে বেশী। সূর্য থেকে ওর দূরত্ব হল মাত্র সাড়ে তিনকোটি মাইল, আর সূর্যের চারদিকে ঘুরে আসে অষ্টাশি দিনে।

বুধের পরে যে, নাম তার শুক্র। গ্রহদের মধ্যে শুক্রই হল সব চাইতে উজ্জ্বল। বছরের কিছুদিন একে দেখি পশ্চিম আকাশে, তখন বলি সাঁঝের তারা। আবার কিছু দিন দেখি ভোরের বেলা, পূব আকাশে। তখন ডাকি শুক-তারা বলে। শুক্র দু'শো পঁচিশ দিনে সূর্যের চারদিকে ঘুরে আসে। সূর্য থেকে এর দূরত্ব হল ছয় কোটি সাত লক্ষ মাইল। শুক্রের চার-দিকে মেঘ ঘিরে আছে, তাই এর সব খবর এতকাল দূরবীনে ধরা পড়েনি। কিছুকাল ধরে আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়ার মানুষ শুক্র গ্রহে যন্ত্রচালিত মহাকাশযান পাঠিয়েছে ওখানকার অবস্থা পরীক্ষা করবার জন্য। সোভিয়েট যানগুলোর নাম 'ভেনাস' আর আমেরিকার যানগুলোর নাম 'মেরিণার'। নানা-রকম খবর তারা পাঠিয়েছে পৃথিবীতে ওখান থেকে। খবরগুলি থেকে আজ পর্যন্ত মোটামুটি এইটুকুই বোঝা গেছে যে শুক্রের বায়ুর চাপ পৃথিবী থেকে ১৮-গুণ বেশী আর ওখানকার বায়ুমণ্ডলে শতকরা ৯0 ভাগই কার্বন-

ডাই-অকসাইড। কাজেই অত তাপে ওখানে মানুষ কেন, কোন জীবনই সৃষ্টি হতে পারে না। অথচ ওখানে প্রাণী বলতে আদৌ যে কিছুই নেই সেকথাও বিজ্ঞানীরা এখনও জোর দিয়ে বলতে পারছেন না। কাজেই শুক্র সম্বন্ধে শেষ কথা জানতে হলে এখনও আমাদের অনেক-দিন দেরী করতে হবে।

এরপরেই আমাদের পৃথিবী। চলেছে তার বাঁধা পথে। খবরটা শুনে হয়তো একটু অবাক হবে। কারণ, পৃথিবীও যে একটা গ্রহ, সে কথা এতক্ষণ বলা হয়নি। পৃথিবীর কথা পরে বলব, এখন মঙ্গলের কথা শোনো।

মঙ্গল, পৃথিবীর পরেই এর পথ। কেমন যেন লালচে এর রং, কেমন যেন পুড়ে যাওয়া, ঝল্‌সে যাওয়া, কেমন যেন অলক্ষুণে ভাব; নামটা যেন ওর মিথ্যে! এ হল পৃথিবীর সব চাইতে কাছের গ্রহ। তাই খালি চোখে একে বেশ পরিষ্কার দেখা যায়।

পৃথিবীর প্রায় নয় ভাগের এক ভাগ এর আয়তন, আর সূর্যকে ঘুরে আসে ছয়শো সাতাশি দিনে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে মঙ্গলের আবহাওয়া বড্ড শুক্‌নো। ওখানে জল বাতাস অবশ্য আছে, তবে তাতে আমাদের পৃথিবীর প্রাণীদের মত প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে না। তার মানে, মঙ্গল নাকি তার দেহের তাপ প্রায় সব খুইয়ে শেষ করে এনেছে। অক্সিজেন গ্যাসে ওর দেহের পাথরগুলি সব মরচে ধরে গেছে। তাই নাকি ওর চেহারা এমন লাল্‌চে।

মঙ্গলে প্রাণী, বিশেষ করে মানুষ আছে কিনা তাই নিয়ে তর্ক চলেছে,—নিষ্পত্তি এখনও হয়নি। একদিন দূরবীনে মঙ্গলের গায়ে কতগুলি সোজা দাগ ধরা পড়েছিল! একদল বিজ্ঞানীরা বললেন, প্রমাণ হল, মঙ্গলে মানুষ আছে—ঐ দাগগুলি হল মঙ্গলবাসীদের হাতে-কাটা খাল। কারণ, মানুষের কাটা না হ'লে খাল কি কখনও অমন সোজা হয়? আজ কিন্তু মানুষকে আর দূরবীনের উপর ভরসা করে থাকতে হচ্ছেনা। আমেরিকা ও সোভিয়েট দেশের মানুষ ওখানেও পাঠিয়েছে বৈজ্ঞানীক মহাকাশযান।

এই মহাকাশযানগুলি (মেরিণার ও মারস্) ওখান থেকে অনেক খবর ও ছবি পাঠিয়েছে পৃথিবীতে। গবেষণাগারে সেগুলো পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে মঙ্গলের আকাশে ঘন মেঘ আছে আর সেই মেঘের মধ্যে জলীয় বাষ্প আছে। সেখানে নাকি নদীরও দেখা পাওয়া গেছে। মঙ্গলের মেরুতে জমে থাকা বরফ নাকি মাঝে মাঝে গলে যায়, আর সেই বরফগলা জল নানাদিক দিয়ে নীচে নেমে এসে নদী-নালার সৃষ্টি করেছে। কিছু কিছু উদ্‌ভিদের খোঁজও নাকি ওখানে পাওয়া গেছে। অক্সিজেনের পরিমাণ সেখানে এতদিন যা অনুমান করা গিয়েছিল তার চাইতে বেশী থাকা সম্ভব বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু ওখানে মানুষ বা অন্য প্রাণী আছে বা নেই তা এখনও কেউ ঠিক করে বলতে পারছেনা।

যাহোক, আমরা বিজ্ঞানী নই, সোজা মানুষ, বুঝি

কম। তাই পণ্ডিতের লড়াই পণ্ডিতের কাছে রেখে, চলো পালাই বৃহস্পতির কাছে।

গ্রহরাজ বৃহস্পতি। গ্রহদের মধ্যে সব চাইতে বড়ো, তাই এর 'রাজ' আখ্যা। চলার পথ মঙ্গলের পরেই। তবে এই দুই পথের মাঝে একটা বড় ফাঁক আছে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন এর ভিতরেই হল উল্কা আর গ্রহকণিকার পথ। তারা-ও ঘুরে বেড়ায় সূর্যের চারদিকে।

বৃহস্পতি সূর্য হতে আটচল্লিশ কোটি বিশ লক্ষ মাইল দূরে। মানে, পৃথিবী সূর্য হতে যত দূরে, এ তার পাঁচ গুণ বেশী। কাজেই পৃথিবী সূর্যের যে তাপ পায়, এ পায় তার সাতাশ ভাগের এক ভাগ মাত্র। সুতরাং গ্রহটি খুব ঠাণ্ডা। সূর্য ঘুরে আসতে লাগে এর বারো বৎসর। এর গতি সেকেণ্ডে আট মাইল,—আর পৃথিবীর উনিশ মাইল।
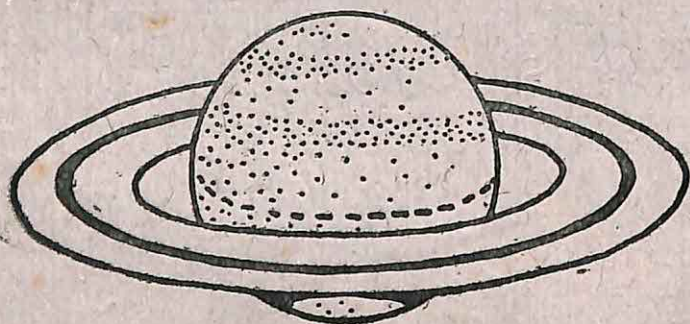
একবার দেখলে আর ভোলা যায় না

এর পর যে গ্রহের পথ,—নাম তার শনি। নাম যেমন, চেহারাও তেমন, একটু বেয়াড়া। একবার দেখলে

আর ভোলা যায় না। ওর কোমরে একঠা বেল্ট্ বাঁধা। এই বেল্ট্টাকে বলে বলয়। এই বলয় কোমরে বেঁধে শনি বেশ ধীরে স্থস্থে সেকেণ্ডে ছ'মাইল বেগে সাড়ে উনত্রিশ বছরে সূর্যকে একবার ঘুরে আসছে। বৃহস্পতির পরেই শনি সবচেয়ে বড় গ্রহ এবং পৃথিবী থেকে পঁচানব্বুই গুণ বড়।

এর পরের গ্রহের নাম দেওয়া হয়েছে ইউরেনাস। সূর্য থেকে এই গ্রহটি একশো আটাত্তরকোটি আঠাশলক্ষ মাইল দূরে। সেকেণ্ডে চার মাইল বেগে ছুটে চুরাশি বছরে একবার সূর্যকে ঘুরে আসে। এর দেহ পৃথিবীর চৌষট্টী গুণ বড়।

এর পরে আর ছটি গ্রহ আছে—নেপচুন আর প্লুটো। এরা পথিবী থেকে এত বেশী দূরে যে এদের সম্বন্ধে বেশী কিছু খবর জানা যায়নি।

নেপচুন সূর্য থেকে দুশো উনআশি কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে। আর সূর্য ঘুরতে লাগে তার একশো চৌষট্টি বছর।

সর্বশেষে প্লুটো। আবিষ্কার হয়েছে মাত্র সে-দিন, —১৯৩০ খৃষ্টাব্দে। এ এত দূরে আছে যে দূরবীন দিয়েও ভাল করে দেখা যায় না। তিনশো ছিয়ানব্বুই কোটি মাইল দূরে থেকে প্রায় দু'শো পঞ্চাশ বছরে প্লুটো একবার সূর্যের চারধারে ঘুরে আসছে। বহু দূরে বলে সূর্যের আলো পায় খুব কম। সেই জন্যই ওর দেহ খুব বেশী ঠাণ্ডা।

মঙ্গল আর বৃহস্পতি, এ দু'য়ের মাঝে যারা ছুটছে তারা সৌরজগতের খামখেয়ালীর দল। এরা সূর্যের সংসারে ঢুকেছে জোর করে। তাই বাঁধা নিয়মে চলতে চায় না। উঁড়নচণ্ডী, নিয়ম-ভাঙ্গা—তাই নাম এদের উল্কা। এরা একা চলে না—চলে দলে দলে, ঝাঁকে ঝাঁকে। পৃথিবী যখন শিশু,—নরম আর গরম, —তখন ওর দেহে ভাঙ্গা-গড়া চলেছিল অবিরত। ভেঙ্গে-চুরে, ফেটে-ফুটে যাচ্ছেতাই হয়ে উঠল ওর চেহারা। সেই ফাটা-ফুটির চোটে কখনো হয়তো পৃথিবীর দেহের খানিক পাতলা ধাতু উড়ে গিয়েছিল মহাশূন্যে—এত শূন্যে, যেখানে টান পৌঁছয় না পৃথিবীর। সেখানে পৃথিবীর এই ক্ষুদ্র অংশগুলি আলোহীন, নাম-গোত্রহীন হয়ে সূর্যের টানে ঘুরে বেড়াতে লাগল অনন্তকাল ধরে। বিশেষ কতগুলি দিন আছে যখন পৃথিবী চলতে চলতে হাজির হয় এদের পথের কাছে। আর যায় কোথা ? পৃথিবীর টান পারে না সামলাতে। সাঁ করে ছুটে আসে পৃথিবীর বুকে। তেজহীন, আলোহীন উল্কা, দারুণ বেগে বাতাস ঠেলে এগুতে থাকে—আর তারই ফলে সে জ্বলে ওঠে।

কিন্তু কথা হল, ঠেলে এগুতে থাকে বলেই জ্বলে উঠবে কেন ?

দুটো জিনিষে ধাক্কা লাগলেই তাপ জন্মে। ধাক্কা যত জোর হবে, তাপ তত বাড়বে। এখন, উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর টানে সাঁসাঁ করে ছুটে আসছে।

পৃথিবী থেকে ১২0 মাইলের মত দূরে এলেই তাকে বাতাসের রাজ্যে ঢুকতে হয়। বাতাসের একটা চাপ আছে। এই চাপের ওজন হল, প্রতি এক ইঞ্চি লম্বা ও এক ইঞ্চি চওড়া জায়গা, যাকে বলে এক বর্গ ইঞ্চি, তার মধ্যে সাড়ে সাত সের। মনে রেখ, আমাদের সবাইর দেহ মোট যত বর্গইঞ্চি, ঠিক তত সাড়ে-সাত সের ওজনের চাপ দেহের ভিতরে ও বাইরে আমরা বয়ে বেড়াচ্ছি। বাইরের ও ভিতরের চাপ সমান থাকে বলেই আমরা বেঁচে আছি। এর কোন একটা বেশী-কম যদি হয় তবেই সর্বনাশ! এখন, এই প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে সাড়ে-সাত সের ওজনের চাপ-ওয়ালা বাতাস ভেদ করে উল্কা তো ছুটে চলেছে পৃথিবীর দিকে। এতে হচ্ছে এক বিরাট সংঘর্ষ, আর তারই ফলে উল্কার ধাতুপিণ্ড জ্বলে উঠ্‌ছে। বন্দুক থেকে যখন গুলি বেরয় তখন কিন্তু তা গরম থাকে না। অথচ দেখ, সেই গুলিটা যেখানটায় গিয়ে লাগে, সেখানটা পুড়ে যায়। এর কারণ কি? কারণ ওই একই! বাতাসের সংঘর্ষে গুলিটা গরম হয়ে ওঠে—তাই।

উল্কার এই ছুটাছুটিকেই আমরা বলি 'তারা-খসা'। কাজেই দেখছ, 'তারা-খসা' তারাও নয়, খসাও নয়—উল্কাপাত। আবার বেশীর ভাগ উল্কাই পথের মাঝে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তাই তাদের চেহারা কেমন আমরা দেখতে পাই না। উল্কাপাতের বিশেষ দিনগুলি ছাড়াও প্রায় রোজই উল্কা নেমে আসছে পৃথিবীতে।

উল্কা-পোড়াছাই যা পড়ছে পৃথিবীতে, তার ওজন যদি নিতে পার তবে দেখবে দিনে গড়ে তার ওজন দাঁড়িয়েছে ১0 থেকে ২0 টন, মানে ২৭0 থেকে ৫৪0 মনের মত। বাতাসের সাথে উল্কার ছাই মিশে গিয়ে আমাদের ঘরদোর নোংরা করছে, বন্ধ দেরাজের মধ্যে ধূলো জমাচ্ছে, আলমারার বইগুলোকে নোংরা করে দিচ্ছে।

পুড়ে শেষ হতে পারেনি, এমন অনেক উল্কা-পিণ্ড কুড়িয়ে পাওয়া গেছে। কলকাতা যাদুঘরে গেলে দেখতে পাবে তাদের,—কেমন কালো কালো পাথরের মত। চেহারা যতটুকু, ওজন তার চাইতে অনেক বেশী। খুব বড় বড় উল্কা যে দেখা যায় না, এমন নয়। একবার সাইবেরিয়া দেশে এত বড় একটা উল্কা পড়েছিল যাতে মস্ত একটা বন পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছিল। আর উল্কাটা গিয়েছিল মাটির ভেতরে এত গভীর হয়ে ঢুকে যে, মানুষ অনেক চেষ্টা করেও তাকে খুঁড়ে বার করতে পারেনি। বিরাট গর্তটা এখনও হাঁ করে আছে সেখানে।

———

চার

চাঁদের কথা

নক্ষত্রের ছেলে গ্রহ। আবার গ্রহের-ও ছেলে আছে, তা জান? তাদের বলে উপ-গ্রহ। এই উপগ্রহদের আমরা বলব চাঁদ। মঙ্গলের চাঁদ দুটি, বৃহস্পতির নয়টি, ইউরেনাসের একটি, আর পৃথিবীর একটি। এই একটি ছেলে কোলে নিয়ে পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছে—তাই ও এত আদরের। তাই ও পৃথিবীর 'সোনার-চাঁদ'! এই চাঁদেরাও সৌরজগতের নিয়ম মেনে চলে। কিন্তু পৃথিবীর মত ডিগবাজী খেতে পারেনা। তাই ওর একটা পিঠে কোনদিনই আলো পড়েনা। সেদিকটা চির অন্ধকার। আমরা দেখতেই পাইনা 'সোনার চাঁদের' সেই কালো মুখখানা। অবশ্য দূরের গ্রহগুলির চাঁদের সংখ্যা এখনও ঠিক ভাবে জানা যায় নি।

আমাদের পৃথিবীর ছেলেবেলা যখন, তখন একদিন ঘুরতে ঘুরতে ওর গা থেকে কতকটা খসে বেরিয়ে যায়। তার থেকেই চাঁদের জন্ম। তারপরে দিনের পর দিন ঠাণ্ডা হতে হতে ওটা এখন একদম ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। চাঁদ আমাদের খুব কাছে বলে ওকে এত বড় দেখায়। কাছে মানে, কত কাছে জান? দু'লক্ষ উনচল্লিশ হাজার মাইল।

চাঁদের আলো দেখে আমাদের কত না আনন্দ হয়।

মনে মনে বলি—চাঁদ, চিরদিন তুমি এমনি করে আমাদের আলো দিও। কিন্তু জান না বোধ হয়, যে আলোর জন্য ওর এত হাঁক-ডাক তা মোটেই ওর নিজের নয়,—সব ধার করা। রাতের বেলা সূর্যের আলো ঠিক্‌রে গিয়ে খানিকটা চাঁদে পড়ে,—আর তাকেই আমরা বলি—চাঁদের আলো। আবার চাঁদে যদি যাও, দেখবে পৃথিবীটাও ঠিক চাঁদের মত আলোয় আলোয় ঝলমল করছে।

চাঁদের গায়ে একটা কালো দাগ আমরা দেখতে পাই। কত গল্প লেখা হয়েছে ও নিয়ে,—কত ছেলে-ভুলানো ছড়া। একটা খরগোশ বসে আছে ওখানে, একটা বুড়ী চরকা কাটছে,—এমনি কত কী। কিন্তু ব্যাপার তা নয়। চাঁদের গায়ে ঠিক পৃথিবীর মত বড়

কিন্তু রয়ে গেছে ভীষণ বড় বড় গর্তগুলো

বড় সব পাহাড়-পর্বত আছে। ওই সব পাহাড়-পর্বতের

খাদের মধ্যে যেখানে আলো পেঁছয় না সেখানটা থাকে অন্ধকার হয়ে,—সেইগুলিই ওই সব কালো দাগ। চাঁদের গায়ে আগ্নেয়গিরিও আছে। তার ভেতর থেকে এক সময় ভীষণ আগুন আর তার সাথে গলানো সব ধাতু বেরুত, যেমনি বেরয় পৃথিবীর আগ্নেয়গিরি থেকে। সেই পাহাড়গুলি এখন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। কিন্তু রয়ে গেছে তাদের গায়ের সেই সব ভীষণ বড় বড় গর্তগুলি। তাদের মধ্যেও আলো পেঁছয় না বলে তাদেরও কালো দেখা যায়।

প্রায় পঞ্চাশটা চাঁদ একত্র করলে আমাদের পৃথিবীর সমান হবে। কিন্তু আকাশে সূর্য ও চাঁদকে আমরা প্রায় একই আকারের দেখি। কারণ? কারণ খুব সোজা। চাঁদ আমাদের খুব কাছে যে! দেহের তুলনায় চাঁদের ওজন কম। বিজ্ঞানীরা এ হিসেবও খুঁজে বের করেছেন। পৃথিবী পঞ্চাশটা চাঁদের সমান হলেও ওজনে প্রায় বিরাশিটা চাঁদের মত। এ-থেকেই বোঝা যায় যে চাঁদ যে পাথর মাটি দিয়ে তৈরি তা পৃথিবীর পাথর মাটি থেকে অনেক হাল্‌কা। চাঁদ যে পৃথিবী থেকে কত বেশী হাল্‌কা তা আর একভাবে প্রমাণ করা যেতে পারে। জিনিস মাত্রই একে অন্যকে টানছে, এটাই হল সৃষ্টির নিয়ম। যার দেহে বস্তু যত বেশী, তার টান তত বেশী। যেমন পৃথিবী যত জোরে টানছে সূর্যকে, সূর্য তার চাইতে ঢের ঢের বেশী জোরে টানছে পৃথিবীকে,—কারণ সূর্যের বস্তুর পরিমাণ পৃথিবীর

চাইতে অনেক বেশী। তাই চাঁদ হালকা বলে তার টানের জোর-ও কম। তুমি যদি এখানে এক মণ বোঝা বইতে পার, চাঁদে পারবে ছ'মণ। এখানে যদি লাফাতে পার চব্বিশ ফুট, চাঁদে পারবে একশ চুয়াল্লিশ ফুট। যাবে নাকি চাঁদে? কিন্তু মুস্কিল হল, লাফানো দূরের কথা, হাঁটতে পারবে তো? কারণ চাঁদে গেলে তোমার ওজন ছ'গুণ কমে যাবে যে। কাজেই পৃথিবীর টান-খাওয়া—অভ্যস্ত তোমার পা চাঁদের মাটিতে তুলতে গেলেই মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে। চাঁদে যারা হেঁটে এসেছে, তারা স্পেস স্যুট [Space Suit] পরে হেঁটেছে। ঐ জামা পরলে দেহের ওজন ছ'গুণ বেড়ে যায়।

এই চাঁদ-ও সৌরজগতের নিয়ম মেনে পশ্চিম হতে পুবে ঘোরে, আর পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। আবার পৃথিবীর সাথে সূর্য-ও প্রদক্ষিণ করে।

চাঁদ সম্বন্ধে আরও অনেক মজার খবর আছে। অমাবস্যা, পূর্ণিমা, জোয়ার-ভাটা, গ্রহণ, এসব ব্যাপারেও চাঁদের কারচুপি অনেক। বিষয়গুলি কিছু গোলমেলে বলে এখানে আর বলা হল না। আর একটু বড় হলে বুঝবে ভাল।

———

পাঁচ

সূর্যের কথা

সূর্যের অনেক খবরই তোমরা এর আগে পেয়েছ। ওযে কী ভীষণ ব্যাপার তাও বোধ হয় কিছুটা বুঝেছ। নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূর থেকে সূর্য আমাদের আলো দিচ্ছে। ক্রমাগত চলেছে তার তাপের বৃষ্টি। কিন্তু ওর মোট তাপের কতটুকু আমরা পাই—জান? কুড়ি কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র! তাও ভাগ্যিস সেই তাপ এক জায়গায় না জমে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। যদি তা না হয়ে এই কুড়ি কোটির একভাগ মাত্র তাপ জমত এসে এক জায়গায়, তবে তা দিয়ে দশ লক্ষ মণ জলকে টগ বগ করে ফুটিয়ে নেয়া যেত এক মিনিটে! এই সামান্য এতটুকু তাপ গোটা পৃথিবীর গায়ে ছড়িয়ে পড়ছে,—তার উপরে মেঘ আর বাতাস অনবরত আমাদের ঠাণ্ডা করে রাখছে, তবুও দেখ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের দিনে গরমে আমাদের প্রাণ কেমন আইঢাই করে উঠে! তবেই বোঝ ওটা কেমন গরম।

কিন্তু এত তেজ সূর্য পাচ্ছে কোথায়? পাবেনা! ওর পেটের মধ্যে দিনে ৩৬০ লক্ষ টন জ্বালানী পুড়ছে যে! ২৭ মণে হল এক টন। এবারে ভাল করে

হিসেবটা কষে বুঝে নাও ব্যাপারটা, আর মার কাছে জেনে নাও রান্না বান্না করতে দিনে তোমাদের কয়লা লাগে কতটুকু। সূর্যের জ্বালানী কিন্তু কয়লা নয়, গ্যাস, নানা রকমের গ্যাস। তার মধ্যে হাইড্রোজেন নামে গ্যাসটাই হল বেশী। এই গ্যাস যেমন পুড়ছে, তেমনি আবার আপনাতেই তৈরি হচ্ছে। একটা বিশেষ অবস্থায় এই হাইড্রোজেন গ্যাস হিলিয়ামে পরিণত হচ্ছে, আর তার থেকেই জন্মাচ্ছে এই অফুরন্ত শক্তি। যে উপায়ে হাইড্রোজেন হিলিয়ামে রূপ পাচ্ছে বিজ্ঞানী ভাষায় তার নাম ফিউসন্ [Fussion]। এই রহস্য জানবার ফলেই মানুষ আজ মহাশক্তিশালী হাইড্রোজেন বোমা বানাতে পেরেছে।

দূরবীন দিয়ে সূর্যের দিকে একবার তাকিয়ে দেখ। যে ভীষণ কাণ্ড দেখবে তাতে গায়ের রক্ত হিম হয়ে যাবে। দেখবে, খালি চোখে দেখা আমাদের শান্ত সূর্যের মধ্যে কি প্রলয় কাণ্ডই না ঘটছে। যত ভয়ের, যত ভীষণ, যত ভয়ঙ্কর, যা কিছু কল্পনা করা যায়, সব কিছুই ছাড়িয়ে যায় সূর্যের রূপ। লক্‌লকে আগুনের হল্‌কা ঘণ্টায় ষাট হাজার মাইল বেগে মহাশূন্যে পাঁচ লক্ষ মাইল পর্যন্ত লাফিয়ে উঠছে, আর জ্বলন্ত গ্যাসের তুমুল ঝড় সূর্যের পেটের মধ্যে অসম্ভব বেগে ঘুর-পাক খেতে খেতে আগুনের হল্‌কাগুলিকে কেবলই উপরে ঠেলে দিচ্ছে। এই গ্যাসের পর্দার ঘনত্ব পাঁচ হাজার থেকে দশ হাজার মাইল।

এই তোলপাড়ের ফলে সূর্যের আলোক মণ্ডলে মাঝে মাঝে ফাঁক হয়ে যায়। তখন সেখানে কিছুকালের মত আর আলো দেখা যায় না, তাই জায়গাটা
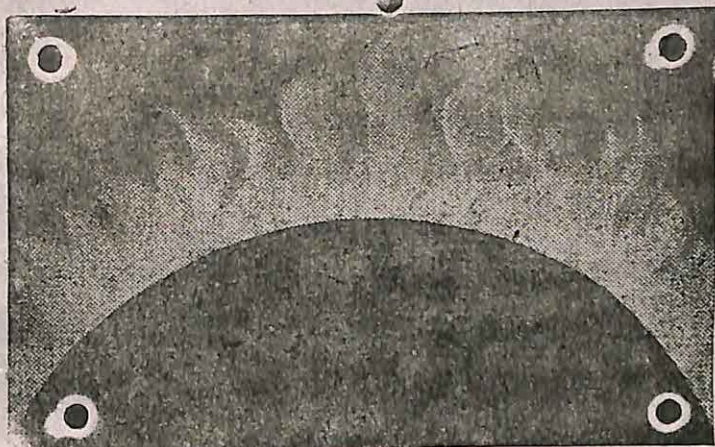
মহাশূন্যে পাঁচ লক্ষ মাইল পর্যন্ত লাফিয়ে উঠ্‌ছে

কালো দেখায়। একে সৌরকলঙ্ক বলে, ইংরাজীতে Sunspot। দেখা গেছে প্রতি এগারো বছর পরে পরে এই কলঙ্কগুলির আয়তন বাড়ে, কমে। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে অনেক বিচিত্র ব্যাপার ঘটে যায়। পৃথিবীর একেবারে উত্তর ও দক্ষিণ এই দিক দুটোকে মেরুদেশ বলে। সেখানে বছরে ছয়মাস রাত্রি আর ছয়মাস দিন। কিন্তু রাত্রির সেই ছয় মাস এক অপূর্ব্ব গোধূলি আলোকে মেরুদেশ ছেয়ে থাকে। একে বলে মেরুজ্যোতি। সৌরকলঙ্কের সঙ্গে এর সম্পর্কটা খুব নিবিড়। সৌরকলঙ্ক বড়

বড় গাছের ভেতরে তার ছাপ রেখে যায়। পুরোণ বড় বড় গাছ কাটলে তার গুঁড়িতে চাকা চাকা কালো দাগ দেখতে পাবে। বছরে বছরে ঐ দাগগুলি পড়ে। ঐ দাগ দিয়ে গাছের বয়স হিসেব করা যায়। কিন্তু সৌরকলঙ্ক যখন খুব বড় হয়ে দেখা দেয় দাগগুলি তখন বেশ মোটা হয়ে ওঠে। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে বিরাট একটা সৌরকলঙ্ক দেখা গিয়েছিল। তার এপাড় থেকে ওপারের মাপ ছিল এক লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল। সৌরকলঙ্কের সঙ্গে পৃথিবীতে ঝড়বৃষ্টির সম্পর্কও বড় কম নয়। সৌর-কলঙ্কের ফলে রেড়িও, টেলিভিশন ও টেলিগ্রাফে বিভ্রাট ঘটে যায়, বিদ্যুৎ চলাচল পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু মনে কর না সূর্য এত ভীষণ বলে নিশ্চয়ই আমাদের শত্রু। মোটেই নয়, বরঞ্চ ওর দৌলতেই আমরা বেঁচে আছি। শুধু আমরা কেন। এই পৃথিবীতে যা কিছু দেখছ—যাদের প্রাণ আছে সবাই টিকে আছে সূর্যের দয়ায়।

সে কি করে হল? বলছি।

কোটি কোটি বছর ধরে সূর্য আমাদের আলো দিচ্ছে। আরও যে কতকাল দেবে তার ঠিক নেই। এই যে সূর্যের তাপ, তাই হল আমাদের জীবন। সূর্যের তাপ না পেলে পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ হত না, ফুল ফুটত না, ফল হত না, পাখী ডাকত না, রংয়ের খেলা

দেখা যেত না, আর আমরা তো থাকতামই না! অফুরন্ত শক্তির প্রাণকেন্দ্র সূর্য তার অফুরন্ত তেজ আর তাপের বর্ষণ দিয়ে পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখছে। পৃথিবী কি তা স্বীকার করবে না?

তারপরে সূর্য আমাদের আরও কত উপকার করে দেখ। পৃথিবীর জল সূর্যের তাপে তেতে-ওঠা বাতাসের টানে বাষ্প হয়ে উপরে উঠে যায়। সেই বাষ্প আবার ঠাণ্ডা হাওয়ার ছোঁয়া লেগে নীচে নেমে আসে, মেঘের চেহারা নিয়ে। তারপরে ভেসে-যাওয়া সেই ভারী মেঘ পাহাড় বা বড় বনের গায়ে লেগে বৃষ্টি হয়ে ঝরে ঝরে গলে গলে পড়ে। দারুণ গ্রীষ্মের দিনে মাটি যখন ফেটে-ফুটে চৌচির হয়ে যায়—খাল, বিল, নদী-নালা যখন শুকিয়ে হা-হা করে ওঠে, এক ফোঁটা জলের জন্য যখন হা-হুতাশ করতে থাকি, তখন আকাশের কোণে জলভরা একখানা কাজল মেঘ দেখলে কতই না আনন্দ হয়! মন নেচে ওঠে —বলে, 'কই গো, কই গো মেঘ, উদয় হও।' তারপরে সেই মেঘ যখন মুক্তোর দানার মত ঝর ঝর করে ঝরে ঝরে পড়ে, আর ভিজা মাটির মিঠে গন্ধ আকাশ বাতাস আকুল করে তোলে, তখনকার প্রাণের আনন্দ ভাষায় বুঝিয়ে বলা যায় না। শান্ত মনে বর্ষা-ক্লান্ত নিঝুম দিনে তোমরাই অনুভব করবার চেষ্টা কর। ভারতের যত কবির যত শ্রেষ্ঠ গান, যত শ্রেষ্ঠ কবিতা, তা রচনা হয়েছে এই বর্ষা নিয়ে,

কালিদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত। এ সব তোমরা বড় হয়ে পড়বে।

বারো মাসে ছ'টা ঋতু, তা নিশ্চয়ই জান। সবকটা মাসে পৃথিবীর চেহারা এক রকম থাকে না—তাও নিশ্চয়ই দেখেছ। কিন্তু কেন থাকে না? কেন ঋতু ছটা ছ' রকম চেহারা নিয়ে প্রতি বছর ঠিক সময়ে নাচতে নাচতে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়—তা ভেবেছ কখনও?

ব্যাপার কি জান? এখানেও সূর্যের সেই খেলা।

আমে-জামে কাঠালে, মাছি আর ঘামাচীতে সুরু হল বৎসর। গ্রীষ্মের আগুন-ঝরা দিন।

তারপরে সাঁই-সাই—সোঁ-সোঁ—টুপ্-টাপ্—ঝর্-ঝর,—ঝম্-ঝম্,—রিম্ ঝিম্,—রিম্-ঝিম্, বর্ষা এলো ঝেঁপে। জলে জলে থৈ থৈ।

শরৎ এলো হাসিমুখে—ঝল্‌মলিয়ে। আকাশে নীল, আর রোদে সোনা। সাদা মেঘ, আর সাদা কাশ, শালুক আর পদ্ম, শিশির আর শিউলিঝরা দিন।

সোনার ধানে আঁচল ভরে, হিমের ওড়নায় মুখ ঢেকে, চোখ ছল্-ছল্, কে আসে ঐ? হেমন্ত না?

তারপরে শীত,—দাঁতে দাঁত ঠক্-ঠক্,—হু-হু—হি-হি,—লেপ কাঁথা কম্বল,—ফাঁটা ঠোঁট আর ফাঁটা গাল, —মিঠে রোদ আর লম্বা ছায়া।

বনে বনে আগুন লাগায় কে রে—পলাশে শিমূলে

কৃষ্ণচূড়ায়? আকাশে বাতাসে এত গান কিসের? ভোমরা, মৌমাছি, একটু দাঁড়াও না ভাই? এত ব্যস্ত কেন? বলোনা, কে আসবে? কে আসবে জান না বুঝি? কোথাকার কে গা তুমি? ঋতুরাজ আসবেন, ঋতুরাজ বসন্ত। তাই তো এত আয়োজন।

বারোমাস পৃথিবী সমান ভাবে সূর্যের আলো পায় না, তাই এই ঋতুর খেলা।

কিন্তু পায় না কেন?

আগেই বলেছি, পৃথিবী যে পথে ঘোরে তা গোল নয়, ডিমের মত। আর পৃথিবী তার মেরুদণ্ডের উপর ঠিক সোজা ভাবে দাঁড়িয়ে নেই, আছে একটু হেলে। এখন, এই কাৎ-ঘাড় নিয়ে ডিমের মত পথে সূর্যের চারদিকে ঘোরার ফলে পথিবীর উপর সূর্যের আলো কখনো বেশী পড়ে, কখনো কম, কখনো সোজাসুজি, কখনো বা তেরছা হয়ে। আর ওদিকে সূর্যও সব সময় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না,—সেও খানিকটা পায়চারি করে। তার এই চলাফেরাকে অয়ন বলে। এই সব কারণেই হয় ঋতুর খেলা। পৃথিবী যদি তার মেরুদণ্ডের উপর সোজাঘাড়ে দাঁড়িয়ে থাকত, আর তার চলার পথ হত ঠিক গোল, ডিমের মত না হয়ে, তবে ঋতুর পরিবর্তন ঘটতই না। তাহলে বারোটা মাস ঠা-ঠা রোদে জ্বলে পুড়ে মরতাম। ভাগ্যিস্ তা হয় নি!

লক্ষ্য করেছ বোধ হয়, গাছপালা সূর্যের আলো কত না ভালবাসে। একটা ছায়া জায়গায় একটা গাছ পুঁতে দাও। কিছুদিন বাদে দেখবে, হয় সে মরে গেছে, নয় তো কাছাকাছি যেখানে সূর্যের আলো পেয়েছে সেইদিকে বাঁকিয়ে উঠেছে। পুঁই লতা, কুমড়ো লতা, এসব তোমরা নিশ্চয়ই চেন। এদের একটা ডগা আজ তুমি ছায়ার দিকে ঘুরিয়ে দাও, দু'-এক দিনের মধ্যেই দেখবে সে রোদ্দুরের দিকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। ঘাসের উপর একখানা ইট ফেলে রাখ, বা একটা হাঁড়ি উপুর করে রাখ। তারপরে কয়েকদিন বাদে তা তুলে দেখ,—দেখবে ওখানকার ঘাস সূর্যের আলো পায়নি বলে কেমন হল্‌দে হয়ে, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

মাঠের মাঝে বা খোলা জায়গায় বট-অশথ, আম-জাম, কাঁঠাল-লিচু গাছগুলি কেমন সুন্দর গোল হয়ে বেড়ে ওঠে—দেখেছ তো? এর কারণ, ওদের ডাল-পালাগুলি চারদিক থেকে রোদ পেয়েছে বলে এক সঙ্গে সমান তালে বেড়ে উঠেছে। দেখে মনে হয় কেউ বুঝি বা কাঁচি দিয়ে সুন্দর গোল করে ছেঁটে দিয়েছে।

তাহলে দেখতে পাচ্ছ—মানুষ, পশু, গাছপালা সবাই সূর্যের আলো চাইছে। কারণ, সবাইকে বাঁচিয়ে রাখছে যে প্রাণশক্তি তাই লুকিয়ে আছে সূর্যের আলোর মধ্যে। গাছের পাতার মধ্যে একটা জিনিস আছে,

বিজ্ঞানী তার নাম দিয়েছেন ক্লোরোফিল—নামটা বাংলা নয়, তবুও মনে রেখ। এই ক্লোরোফিল দিয়েই গাছ সূর্য হতে প্রাণ-শক্তি টেনে নেয়, আর জমিয়ে রাখে তার দেহে। তারপরে মাটি থেকে, বাতাস থেকে আর যেটুকু দরকার সেটুকু খাবার টেনে নিয়ে পাতায় পাতায় চলে তার রান্না। রান্নার পরে খাবারগুলিকে চালিয়ে দেয় সারা দেহে,—ফুলে, ফলে, গুঁড়িতে, পাতায়। ক্লোরোফিল সূর্যের আলো থেকে যে খাবার লুফে নেয়, বেঁচে থাকতে তা আমাদেরও দরকার। কিন্তু আমরা তো পারি না তাকে আকাশ থেকে সোজা টেনে নিতে। তাই আমাদের নির্ভর করতে হয় গাছের উপরে। তাই যখন ভাত, ডাল, তরি-তরকারী খাই—তখন আমরা ওদের দেহের ভেতরে জমানো সূর্যের শক্তিটা খেয়ে দেহ পুষ্ট করি। আবার যখন দুধ, ঘি, মাংস, এইসব খাই, তখন গাছপাতা খেয়ে পুষ্ট পশুদের কৃপায় আমরা তুষ্ট হই!

শুধু এই নয়। সূর্যের বাহাদুরী আরও অনেক। তোমরা রেল, ষ্টিমার, মোটর, এরোপ্লেন, এসব নিশ্চয়ই দেখেছ। শুনে অবাক হবে যে এরাও চলছে সূর্যের দয়ায়। রেল, ষ্টিমার, এসব চলে কিসে? কয়লায়। আর মোটর, এরোপ্লেন? পেট্রোলে। এই কয়লা এবং পেট্রোল, এদের মধ্যে লুকোনো শক্তিটাও আসলে সূর্যের শক্তি। এক সময়ে পৃথিবী বন-জঙ্গলে ছেয়ে ছিল,—বড় বড় গাছ,—প্রকাণ্ড তাদের

দেহ। ক্রমে কেউ তারা মরে গিয়ে, কেউ বা ভূমিকম্প বা অন্য কারণে মাটির নীচে আস্তে আস্তে বসে গেল। এইভাবে তারা প্রাণ হারাল বটে, কিন্তু সূর্যের আলোর গুণ নষ্ট হল না। তারা মাটির নীচে ঢুকে দিনের পর দিন মাটির চাপে ও তাপে ধীরে ধীরে কঠিন কালো কয়লা বনে গেল। আমাদের দেশে অনেক বড় বড় কয়লার খনি আছে, অনেক সময়ে মাটি খুঁড়ে মাইলের পরে মাইল শুধু কয়লাই বেরিয়েছে। একদিন ওরা ছিল বড় বড় গাব বন। তারপরে পৃথিবীতে কত মানুষ, কত পশু মরেছে। পোড়ানো যাদের হয় না, তাদের হাড় মাংস তো মাটির তলায় চলে যায়। সেই সব হাড় মাংসের মধ্যেও তো লুকোনো থাকে সূর্যের তেজ। মাটির চাপে, তাপে এবং বিশেষ অবস্থায় তারাই সৃষ্টি করে কেরোসিন বা পেট্রোল। কাজেই ট্রেন যে ছুটছে, মোটর যে দৌড়াচ্ছে, এরোপ্লেন যে উড়ছে—এতো সবই সূর্যের জন্য।

আরও অবাক খবর আছে। পৃথিবীতে যত রংয়ের খেলা দেখছ,—তাও আসছে ওই সূর্য থেকে। সূর্যের আলো তো সাদা—তবে এ কি করে হয়? শোন তবে।

ঝাড়লণ্ঠনের তিন-পিঠ-ওয়ালা একখানা কাঁচ যোগাড় করে তার ভেতর দিয়ে তাকাও সূর্যের দিকে। দেখবে রোদ্দুরের সাদা রং আর সাদা নেই। চোখের

সামনে ভেসে বেড়াচ্ছে সাতটা রং। এই সাতটা রং-ই হল পৃথিবীর সব রং-এর গোড়া। এদের পাঁচ-মিশালিতেই অপর রংগুলির জন্ম। সাতটা রং কি কি? বেগ্নী (Violet), নীল (Indigo), আসমানী (Blue), সবুজ (Green), হলদে (Yellow), কমলা (Orange), এবং লাল (Red)। ইংরাজী নামগুলির প্রত্যেকটার প্রথম অক্ষর নিয়ে একটি কথা তৈরী হয়েছে,—Vibgyor—'ভিব্জিয়র', বিজ্ঞানীদের ভাষায় এই একটি কথাতেই সূর্যের সাত-রং বোঝায়। বাংলাতেও এই ধরণের একটা কথা আছে, শিখে রাখ—'বেণী আসহ কলা' [খাও]।

এখন কি ভাবে এই রংগুলি আমরা দেখতে পাই?

মনে রেখ, যে জিনিস যে রংটাকে ফিরিয়ে দেয়, সেই এসে দাঁড়ায় আমাদের চোখের সামনে। গাছের সবুজ পাতা সবুজ-ই নয়। তার মানে, পাতা সবুজ ছাড়া আর ছ'টা রংকেই হজম করেছে,—ফিরিয়ে দিয়েছে সবুজকে। আর সে এসে নালিশ জানাচ্ছে আমাদের কাছে। লাল গোলাপ লালকে দিয়েছে বিদায় করে, আর টেনে নিয়েছে বাকী গুলোকে। কাজেই পাতা যা ত্যাগ করল, গোলাপ যা ফিরিয়ে দিল,—তা স্থান পেল আমাদের চোখে, আর চোখের ভেতর দিয়ে মনে। চোখ বললে শান্তি পেলাম, মন বললে ধন্য হলাম!

সাদার বাহাদুরী কিন্তু সর্বস্ব ত্যাগে। আর কালোর নিন্দা তার কৃপণতায়। সাদা যাকে বলো, সে বলে,—চাই না আমি কিছু,—ফিরিয়ে দিলাম তোমার সব। তাই সাত-রং তার সমস্ত ঝলমল্ নিয়ে মুখ ভার করে ফিরে যায়,—আর তাই না সাদা!

কালো বলে,—ছাড়ব না আমি কাউকে,—নেব আমি সব। তাই কৃপণের কারাগারে বন্দী হল সাত-রং। মানুষের চোখ ফিরে পেল না কিছুই,—দুনিয়া হল কালো। রং-দুনিয়ার মহা-কৃপণ, মহা-লোভী এই কালো! কাজেই দেখ, কি রহস্য লুকিয়ে আছে সূর্যের আলোতে।

তোমরা যদি রোজ ভোরে উঠে সূর্যোদয় দেখ এবং নতুন সূর্যের আলোতে খানিকটা বেড়িয়ে নেও, দেখবে কেমন আনন্দ লাগে,—শরীর কত ভাল থাকে। আজকাল সূর্যের আলো দিয়ে নানারকম রোগের চিকিৎসা হচ্ছে।

পিতা যেমন সন্তানকে পালন করেন স্নেহ দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে, শাসন দিয়ে, আহার দিয়ে—পিতা-সূর্যও তেমনি আমাদের পালন করছেন প্রাণশক্তির অফুরন্ত বর্ষণ দিয়ে, তাপ দিয়ে, তেজ দিয়ে, আলো দিয়ে, জল দিয়ে, বাতাস দিয়ে, রং-এর খেলা আর বনবনানী, পাখপাখালী, আর ফুল-ফল-শস্যের মহোৎসব দিয়ে।

সূর্য আমাদের এত উপকার করে বলেই হিন্দু ও পার্শীরা সূর্যের পূজা করে। তারা বলে, সূর্য যখন সমস্ত শক্তির আধার, তখন সূর্যই ভগবান। মহাভারতের মহাবীর কর্ণ রোজ সূর্যের উপাসনা করতেন।

হিন্দু শাস্ত্রে সূর্য উপাসনার সুন্দর একটি মন্ত্র আছে, তোমরা তা মুখস্থ করে রাখতে পার ঃ

জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

———

ছয়

রাত্রি দিন কি করে হয়

আকাশের খবর কতই তো শুনলে। কিন্তু এখনও অনেক, অনেক খবর আছে যা তোমাদের শোনানো হয় নি। তা এখন তোলা রইল—নইলে সব গুলিয়ে যাবে। বড় হয়ে ওসব পড়ে নিও।

এখন শোন রাত্রি দিন কি করে হয়।

তোমরা তো জান নীহারিকা, নক্ষত্র, সূর্য, চাঁদ এরা কেবলই ঘুরছে—আর তার সাথে আমাদের পৃথিবীটাও। তবে পৃথিবীর ঘোরার রকমটা সূর্য প্রভৃতির চাইতে একটু আলাদা। অর্থাৎ সূর্যের গতি এক করম—পৃথিবীর দু'রকম। কিন্তু কেমন তরো? আচ্ছা, তোমরা তো সবাই লাটিম খেলা জান। মনে কর, তোমাদের কেউ একটা লাটিম ছুঁড়ল। সেটা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে তার আলের উপর বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল। আর কেউ ছুঁড়লে আর একটা। সেটা শুধু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে না ঘুরে, প্রথমটাকে ঠিক মধ্যে রেখে তার চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। এখন প্রথমটা শুধু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘুরছে আর অন্যটা যেমন নিজের আলের উপর ঘুরছে, তেমন প্রথমটাকে মধ্যে রেখে তার চারদিকেও ঘুরছে।

এও ঠিক তেমনি। সূর্যটা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পাক খাচ্ছে একটা কেন্দ্র নিয়ে, আর পৃথিবীটা ডিগ্‌বাজী খেতে খেতে তার চারদিকে ঘুরে মরছে। এই ডিগবাজী খাওয়াতে পৃথিবীর একটা না একটা পিঠ সব সময়েই সূর্যের দিকে ফেরানো থাকে।
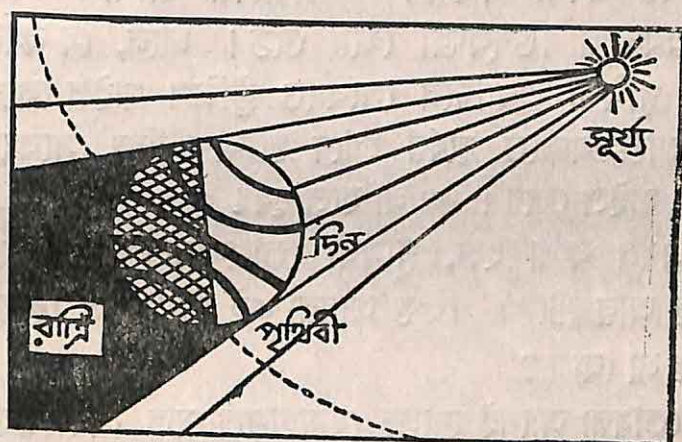
তাতে যে পিঠে আলো পড়ে, তাকেই বলি দিন। অন্য পিঠটায় আলো পড়ে না, ডুবে থাকে অন্ধকারে, তাকে বলি রাত্রি। কাজেই যখন দিন ফুরালো, রাত্রি এলো, আবার রাত্রি ফুরিয়ে দিন এলো,—তখন জানবে পৃথিবী একবার ডিগবাজী খেয়ে উঠল। এই একটিবার ডিগ্‌বাজী খেতে পৃথিবীর সময় লাগে চব্বিশ ঘণ্টা,—মানে একদিন।

পৃথিবীর এক ডিগ্‌বাজীতে তো একটা দিন হল। কিন্তু সে যে ঘুরে এলো সূর্যের চারদিক—তাতে কি

হল ? তাতে হল একটা বছর,—মানে তিনশো পয়ষট্টি দিন।

পৃথিবীর এই যে ডিগ্‌বাজী-খাওয়া আর সূর্য-ঘোরা—এতে সে কি বেগে ছোটে জান ? সেকেণ্ডে উনিশ মাইল। আর সূর্য যে ঘুরছে, তার বেগ হল সেকেণ্ডে দু'শো মাইল। আমাদের ছাব্বিশ দিনে সূর্য একবার ডিগ্‌বাজী খেয়ে ওঠে। মানে, যে কাজ করে পৃথিবী একদিনে সেকেণ্ডে উনিশ মাইল বেগে, সে কাজ করতে সূর্যের লাগে ছাব্বিশ দিন, সেকেণ্ডে দু'শো মাইল বেগে। এ না হলে সূর্য !

এখন কথা হল, পৃথিবী তো কেবলই ডিগ্‌বাজী খাচ্ছে আর ছুটছে। কিন্তু আমরা এই ঘূর্ণিপাকে ছিটকে যাচ্ছি না কেন ?

তোমরা আগেই শুনেছ যে মহাশূন্যে যত নীহারিকা, নক্ষত্র, সূর্যগ্রহ, উপগ্রহ আছে তারা সবাই সবাইকে টানছে। এর মধ্যে যার বস্তু যত বেশী, তার টানের জোর তত বেশী। আবার দূরত্বের কম বেশীতেও টানের জোর বেশী কম হয়। এই টানাটানির ব্যবস্থা এমন নিখুঁত, যে তার ফলে কেউ কারুর পথ ছেড়ে এক চুলও নড়তে পারে না ; তাই-না, এই বিশ্ব সংসার এক নিয়মে বাঁধা। কোথাও বেসুরো নেই, তাল কেটে যাওয়া নেই। ঠিক এই নিয়মেই পৃথিবী টানছে আমাদের,—আমরাও টানছি পৃথিবীকে। কাঠবিড়ালীটা ল্যাজ উচিয়ে ওই যে

গাছের ডালে নাচ্‌ছে—ও-ও টানছে গাছকে, গাছও ওকে—আবার দুই-ই পৃথিবীকে,—পৃথিবী-ও দুইকে। পৃথিবীর ওজন বেশী, সে অনেক বড়, আর আমাদের সব-কাছে। কাজেই আমাদের উপর তার টানের জোর সবচেয়ে বেশী। তাই, সে টানতেই লেগে আছি আমরা তার গায়ে,—ছিট্‌কে যাওয়ার পথ কই? একখানা পা তুল্‌লেই লাগল অমনি টান,—নেমে এলো মাটিতে। লাফ্‌ দিলাম শূন্যে,—অমনি পড়লাম ধপাস্‌ করে, মাটি দিল টান্‌,—হেঁই-ও! যাবে কোথায়? ওই যে চিলটা উড়ছে অনেক উপরে,—এরোপ্লেন ছুট্‌ছে মেঘের গায়ে,—ওরা-ও কি চিরদিন শূন্যে ভেসে থাকতে পারে? পৃথিবীর টানের জোরের চাইতে খানিকটা বেশী জোর তারা যোগাড় করে শূন্যে উঠল বটে; কিন্তু চিলের ডানা দুটি যখন ক্লান্ত হয়ে আসে, আর এরোপ্লেনের তেল যখন ফুরিয়ে যায়,—ফিরতে হয় আবার পৃথিবীরই কোলে।

এমনি করেই পৃথিবী আমাদের বুকে আঁকড়ে রাখছে আর কানে কানে বলছে—‘যেতে নাহি দিব’।

এই টানাটানি, বিজ্ঞানীর ভাষায় যাকে বলে মহাকর্ষ, তার খবর যিনি আমাদের প্রথম দিলেন, নাম তাঁর—কেপ্‌লার। তারপরে এলেন আর একজন, নাম ন্যুটন। ভাবুক লোক। চুপচাপ থাকেন, আর কি যেন ভাবেন। লোকে বলত ক্ষ্যাপাটে, আরও কত কী! একদিন দেখলেন, একটা ফল পড়ল গাছ

থেকে। অমনি ভাবনা ঢুকলো মাথায়। ফলটা নীচে-ই বা পড়ল কেন, উপরদিকেই বা উঠে গেল না কেন? রাজ্যের ভাবনা! সে ভাবনার কি শেষ আছে? অবশেষে তিনি আমাদের শোনালেন, বস্তু যার যত বেশী, টান তার তত বেশী। তাই সূর্যের টানে গ্রহেরা ঘুরছে, আর পৃথিবীর টানে ফল পড়ছে। আর তাই-না এই সৃষ্টি চলছে নিয়ম বাঁধা পথে; আর তার পথ-চলার পায়ে পায়ে বেজে উঠছে কত সুর, কত ছন্দ,—গ্রীষ্ম-বর্ষায়, শরৎ-হেমন্তে, শীত-বসন্তে, ফুলে-ফলে, পাখীর গানে, সূর্যের উদয়-অস্তের পথে, চাঁদের আলোয়, আর লাখো-তারার অনাদিকালের রাত-জাগায়!

কিন্তু এই টান যদি থেমে যায়? নক্ষত্র যায় স্থির হয়ে? গ্রহেরা ঘুরতে ঘরতে থমকে দাঁড়ায়? পৃথিবী আর আঁকড়ে রাখে না বুকের শিশুকে? তবে? তবে তুমি, আমি, বাতাস, জল, সব নিমেষের মধ্যে মহাশূন্যে উড়ে যেতাম। কে আমি, কে তুমি? কোথায় ফুল, ফল, নদী, জল? কোথায় কে? পৃথিবী ভেঙ্গে যেত খান্ খান্ হয়ে। চাঁদ উড়ে যেত কোথায়? আর মহাশূন্যে নীহারিকা-নক্ষত্রের বুকে কী প্রলয় ঘটত কে জানে?

———

সাত

পৃথিবীর কথা

এই তো আমাদের পৃথিবী। মায়ের স্নেহে কোলে আগলে-রাখা, ফুল-ফলে, লতায়-পাতায় ঢাকা, পাখীর গানে মুখর-করা, আলোর ঝর্ণায় স্নান-করা আমাদের সুন্দরী পৃথিবী।

কিন্তু কি করে এ সম্ভব হল? জ্বলন্ত বাষ্পীয় সূর্যের গা থেকে ছুটে-পড়া সামান্য একটা টুক্‌রো থেকে পৃথিবী যে দিন জন্ম নিল, সে দিন সে-ও তো ছিল পিতা-সূর্যের মত দুরন্ত আগুনের গোলা। কোন্ যাদু বলে সেই আগুনের গোলা আজিকার এই রূপ-রস-গন্ধে-ভরা পৃথিবী হয়ে দাঁড়াল, সেই রহস্যের কথাই বলব এখন।

ঘুরপাক-খাওয়া জ্বলন্ত সূর্যের গা থেকে ছোট্ট একটা টুকরো তো একদিন গেল ছুটে। মহাকর্ষের নিয়মে সে কিন্তু বেশী দূরে ছুটে পালাতে পারল না। খানিকটা গিয়েই থামতে হল। তারপরে সূর্যের টান থেকে বাঁচতে গিয়ে আরম্ভ হল তার ডিগ্‌বাজী খাওয়া আর সূর্যের চারদিকে ঘোরা। সেই ঘুরে মরা আজও তার থামেনি। থামবেও না বোধ হয়।

সেদিনকার সেই আগুনে-পৃথিবী ছিল সূর্যের মতই বাষ্পীয় আর গরম। তারপরে যতই দিন যেতে

লাগল, ততই তার ভিতরের বস্তু জমাট বাঁধতে লাগল,—আর ততই সে ঘন হতে লাগল,—আর তাপ উঠল আর-ও বেড়ে। যতই ঘন হতে লাগল ততই তার চেহারা চল্‌ল ছোট হয়ে। তারপরে একদিন সে পৌঁছল গরম হবার শেষ সীমায়। তারপর থেকে আরম্ভ হল তার জুড়োবার পালা। সে পালা আজও চলছে। এমনি একদিনে সূর্যের টানে তার গা থেকে খানিকটা গেল খসে। তোমরা জান, পৃথিবীর দেহ-খসা ছোট্ট সেই টুকরোটাই পরে চাঁদ হয়ে দাঁড়াল।

বহু, বহু-বছর কেটে গেল। জ্বলন্ত পৃথিবী দিনের পর দিন ঠাণ্ডা হতে লাগল। তখন ধীরে ধীরে ওর গায়ে একটা সর পড়তে লাগল, দুধে যেমন সর পড়ে। কিন্তু ভেতর তার তখনও ভীষণ গরম আর পাতলা। সেই সময় চারদিক ছিল ভীষণ অন্ধকার,—আর উপরে শুধু কালো কালো মেঘ। সেই ঘন কালো মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে পারত না। তারপরে নামল একদিন বৃষ্টি। কিন্তু বৃষ্টির জল পৃথিবীতে পৌঁছবার আগেই পৃথিবীর তাপে বাষ্প হয়ে আবার উপরে উঠে গেল।

কেটে গেল আরও বহু বছর। এত দিনে পৃথিবীর সরটা অনেকটা পুরু হয়ে উঠেছে, আর তাপও কমেছে অনেকটা। তখন বৃষ্টির জল পৃথিবীর গায়ে দাঁড়াতে লাগল। বছরের পর বছর ধরে তখন চলেছিল

বৃষ্টি,—অঝোরে একটানা বৃষ্টি। গোটা পৃথিবী জলে জলে থৈ থৈ করে উঠল। এতে পৃথিবী তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হতে লাগল। কিন্তু খানিক নীচে তখনও আগুনের তোলপাড়। সেই তোলপাড় মাঝে মাঝে পিঠের সরটাকে ঝেড়ে ফেলে ঠেলে বেরুতে চেষ্টা করত। স্বভাবতই যেখানকার সরটা একটু পাতলা, সেখান দিয়েই ঠেলে বেরুত আগুন। এ যেন একটা বেলুনকে ফুঁ দিয়ে ফোলাতে ফোলাতে হঠাৎ একটা জায়গা উঁচু হয়ে ফট করে ফেটে যাওয়া। এতে পৃথিবীর কোন কোন জায়গা গেল বসে, আবার কোন কোন জায়গা উঠল উঁচু হয়ে। এমনি ধারা ভাঙ্গা গড়ার পালা চল্‌ল বহু, বহু কাল।

এমনি করেই যত সমুদ্র, পাহাড় ও ডাঙ্গার সৃষ্টি হল।

কিন্তু মনে রেখ, সূর্যের আলো তখনও মেঘ ঠেলে পৃথিবীর গায়ে পোঁছতে পারেনি। ঠিক এমনি একদিনে হয়তো পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের জন্ম হয়েছিল,—প্রোটোপ্লাজম্‌ যার নাম দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা,—ঘন লালার মত,—আকারহীন. জলে ভেসে বেড়াত। এরাই হল পৃথিবীর বুকে প্রাণের নীহারিকা। এরা বেঁচে থাকত আমাদের মত সূর্যের আলোর তাপে নয়, নীচ থেকে পৃথিবীর গরমে।

হঠাৎ একদিন এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেল। আকাশের মেঘগুলি হাল্‌কা হয়ে উঠল,—আর তার

ফাঁক দিয়ে চিরে বেরুল সূর্যের আলো। পৃথিবীতে প্রথম সূর্যের আলো পড়ল। পৃথিবীর তপস্যা শেষ হল, পিতা-সূর্য তাঁর আশীর্বাদের আলো বুলিয়ে দিলেন শিশু পৃথিবীর মাথায়। সব যেন পাল্টে গেল এক পলকে। আলোয় আলোয় চারদিক ঝল্মল্ করে উঠল। আরম্ভ হল রাত্রি দিন, আরম্ভ হল ঋতুর খেলা, হেসে উঠল চাঁদ, ঝক্মক্ করে উঠল তারায় ভরা রাতের আকাশ। আর সেই দিন প্রকৃত প্রাণের সূচনা হল এই পৃথিবীতে। পৃথিবীর জয়-যাত্রা হল সুরু।

আরও লক্ষ বছর কেটে গেল। পৃথিবী চল্ল আরও ঠাণ্ডা হয়ে। আর তার সরটা হতে লাগল আরও পুরু। এমনি করে ওই সরটা আজ পর্যন্ত আমাদের পায়ের নীচে পঞ্চাশ মাইল অবধি জমাট বেঁধেছে। এই পঞ্চাশ মাইল ব্যাপী সরটাকে বিজ্ঞানী ভাষায় বলে ভূ-ত্বক্। ভূ মানে পৃথিবী, আর ত্বক্ মানে চামড়া! এই ভূ-ত্বক্, মাটি ও নানা রকমের কাঁকর-পাথরে তৈরী। এর পরে এক হাজার সাতশো ত্রিশ মাইল ঢেকে আছে শক্ত ভারী পাথরে, আর তার সাথে মেশানো আছে লোহা প্রভৃতি অনেক রকম ধাতু। তারপরে প্রায় দুহাজার মাইল বেড়ে আছে লোহা, নিকেল প্রভৃতি ধাতু, গলানো অবস্থায়। পৃথিবীর পেটের ঠিক মধ্যস্থল বা কেন্দ্র আমাদের পায়ের চার হাজার মাইল নীচে। কাজেই দেখতে

পাচ্ছ, পৃথিবীর পেটের মধ্যে এখনও আগুনের তোলপাড় চলছে।
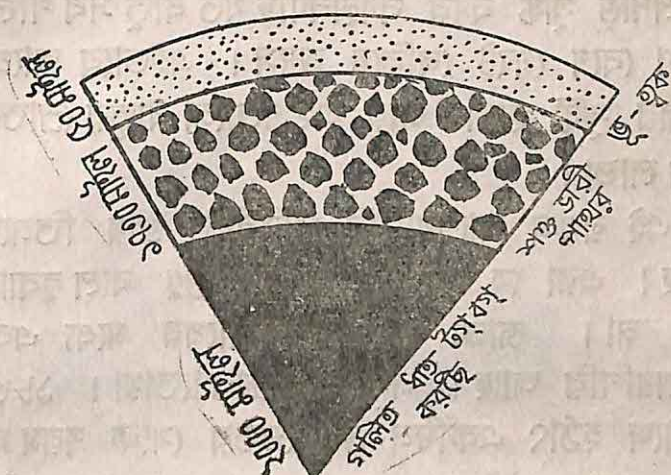
পৃথিবীর পেটের খবর

কিন্তু কি করে আমরা পৃথিবীর পেটের আগুনের এই দুরন্তপনার খবর জানতে পারি ?

চাঁদের গায়ে আগ্নেয়গিরির কথা আগেই তোমাদের বলেছি। বিভিন্ন কারণে ভূ-ত্বকে ক্রমাগত ফাটল সৃষ্টি হচ্ছে। এই ফাটল দিয়ে ঠাণ্ডা জল পৃথিবীর পেটের মধ্যে ঢুকে পড়ে। সেই জল চোঁয়াতে চোঁয়াতে যখন পৃথিবীর পেটের আগুনের কাছাকাছি আসে, তখন গরম কড়াইতে জল পড়লে যেমন হয়, ঠিক তেমনি, এক মুহূর্তে জল আর জল থাকে না, ছ্যাক্ করে বাষ্প হয়ে উবে যায়। আর তক্ষুণি সেই বাষ্প নিজ ধর্ম অনুসারে ঠেলে উঠতে চায় উপরদিকে। ভূ-ত্বকের

যে অংশ দুর্বল সেই অংশ দিয়ে সে হু-হু করে ঠেলে বার হয়। কিন্তু সে তো একা বার হয় না, বিরাট তোলপাড় সৃষ্টি করে কাছাকাছি যত ধাতু সব গলিয়ে দারুণ বেগে ফেটে বেরিয়ে আসে। এইভাবে আগ্নেয়-গিরির সৃষ্টি হয়। আর এই গলানো ধাতুর স্রোতকে বলে লাভা।

এই রকম আগ্নেয়গিরি পৃথিবীতে প্রায় তিনশো' আছে। এরা যে কী ভয়ঙ্কর তা শুধু বলে বুঝানো যায় না। জাভা ও সুমাত্রা দ্বীপের মধ্যে একটা আগ্নেয়গিরি আছে। নাম তার ক্রাকাতোয়া। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে হঠাৎ একদিন ওর ভেতর থেকে গরম বাষ্প আর লাভা ছুটে বেরুতে থাকে। এতে প্রায় চল্লিশ-হাজার লোক মারা যায় এবং তিনশো-পঞ্চাশটি গ্রাম ধ্বংস হয়। প্রায় দুহাজার মাইল দূর থেকে এর শব্দ শোনা গিয়েছিল। কোথায় লাগে এ্যাটম্ বা হাইড্রোজেন বোমা!

ইটালী দেশে আর একটি ভয়ঙ্কর আগ্নেয়গিরি আছে। নাম তার ভিসুভিয়াস্। এই ভিসুভিয়াসের কাছে দেশের লোকেরা সুন্দর একটি নগর গড়ে তুলে-ছিল,—নাম তার পম্পাই। লোকজনে-ভরা পম্পাই,—দেশ জোড়া তার নাম। কি একটা উৎসবে সেদিন সহরের লোকেরা মেতে আছে। এমন সময় ভীষণ শব্দ হল। হাজার বোমা এক-দমকে ফাটার চাইতে-ও বড় শব্দ। সমস্ত সহরটা থর্থর্ করে কেঁপে উঠল।

লোকজন সব ঘর ছেড়ে বাইরে ছুটে এলো। তাকিয়ে দেখে কি, তাদের অমন সুন্দর পাহাড়, ভিসুভিয়াসের মাথা দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে কেবল ধোঁয়া
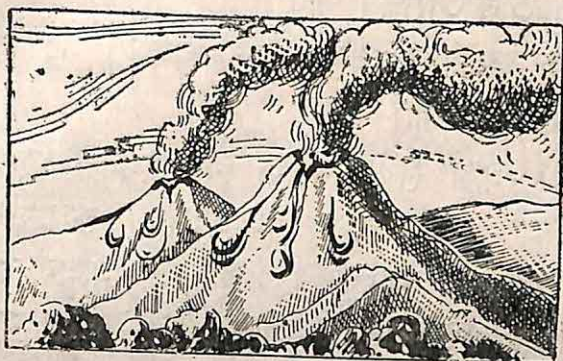
কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে কেবল ধোঁয়া আর ধোঁয়া

আর ধোঁয়া। বেশীক্ষণ আর দেখতে হল না। হঠাৎ পাহাড়ের মাথাটা তার গা থেকে ছিঁড়ে আকাশের দিকে উড়ে গেল। আর সাথে সাথে ছুটে নামল গলানো ধাতুর স্রোত,—জলের মতন পাত্লা আর আগুনের মত টক্টকে লাল। তারপর দেখতে দেখতে পম্পাই পুড়ে ছাই হয়ে চাপা পড়ে গেল লাভা স্রোতের তলায়। আজ দু'হাজার বছর পরে খুঁড়ে খুঁড়ে সেই পোড়া সহর বার করা হয়েছে।

তারপরে, তোমরা গরম ফোয়ারার কথা শুনেছ। কোন কোন পাহাড়ের গা দিয়ে অবিশ্রান্ত ধারায় জল বেরুচ্ছে,—শুধু গরম জল,—যেন এই মাত্র কেৎলি করে কেউ ফুটিয়ে এনেছে। বাড়ীর কাছে বীরভূম

জেলায় বক্রেশ্বরে, আর বাংলাদেশের চট্টগ্রামে এমনি সব ফোয়ারা আছে। সুবিধা হলে দেখে এসো। পণ্ডিতগণ মনে করেন, এই সব জলের উষ্ণতার কারণ-ও পৃথিবীর পেটের মধ্যকার আগুন।

এই তো হলো পৃথিবীর পেটের খবর। এবার তার পিঠের খবর শোনো।

পৃথিবী আর সূর্যের মাঝে যে ন'কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল ফাঁক আছে, তার অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে হাওয়া বা বাতাস। পৃথিবী থেকে কত-দূর পর্যন্ত হাওয়া আছে তা এখনও ঠিক জানা যায়নি। তবে অনুমান করা হয় যে সমুদ্র থেকে আকাশের দিকে চারশো' মাইল পর্যন্ত হাওয়া আছে। উল্কা-পাতের কথা তোমাদের আগেই বলেছি। ঠাণ্ডা একটা ধাতুপিণ্ড পৃথিবীর টানে সাঁই করে নেমে আসে, আর বাতাসের ধাক্কা লেগে জ্বলে ওঠে। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, এই জ্বলুনি সুরু হয় একশো' কুড়ি মাইল উপরে। কাজেই এটা অনুমান করা যায় যে একশো' কুড়ি মাইলের অনেক উপরেও হাওয়া আছে। কারণ, অনেকক্ষণ ধরে হাওয়ার সঙ্গে ধস্তাধস্তি না হলে সে তো আর জ্বলবে না। যেমন নাকি দুটো প্যাঁকাঠি অনেকক্ষণ না ঘষলে জ্বলে না।

এখন, এই যে হাওয়া, এ কি ভাবে সৃষ্টি হল দেখ।

জন্ম-সময়ে পথিবী তো ছিল শুধু গ্যাসে ভরা। নানা রকমের গ্যাস। সেই গ্যাসের পৃথিবী আস্তে

আস্তে হল তরল, তারপরে তরল থেকে শক্ত। এর মধ্যে কতগুলি গ্যাস ঠাণ্ডা হয়েও কঠিন হতে পারল না,—কখনও দুটো, কখনও তারও বেশী মিশে গিয়ে কতগুলি তরল পদার্থের সৃষ্টি করল। যেমন জল। আর কতগুলি—কোনটা একা, কোনটা আবার দু-একটার সাথে হাত মিলিয়ে গ্যাসই রয়ে গেল। এমনি একটা মিশ্রিত গ্যাসই হল বাতাস।

কিন্তু বাতাসের খবর জানবার আগে আর একটা ভারী জরুরী খবর আছে, যা জেনে রাখলে ব্যাপারটা বুঝতে সুবিধা হবে।

বিজ্ঞানীরা খবর দিয়েছেন যে পৃথিবীতে যত জিনিসই আমরা দেখি বা অনুভব করি তার গোড়ায় বা মূলে রয়েছে মাত্র ৯৭টি পদার্থ। এদের বলা হয় মৌলিক পদার্থ। অর্থাৎ এই ৯৭টার যোগ-বিয়োগেই দুনিয়ার সব কিছু। প্রথমে এই সংখ্যা স্থির হয়েছিল ৩৬। তারপরে খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল ৯২। এখন আরও ৫টির খবর পাওয়া গেছে।

কি ভাবে শোনো!

সূর্য থেকে গ্রহের জন্ম, বিজ্ঞানী মহলে এ কথাটা চালু হওয়ার পর থেকেই নানা রকম প্রশ্ন, নানা রকম সন্দেহ জেগে উঠল চারদিকে। কথাটা কেউ মানলেন, কেউ মানলেন না; বল্‌লেন, প্রমাণ চাই, চোখে দেখতে চাই, যেমন দেখিয়ে ছিলেন গ্যালিলিও। বিজ্ঞানীদের মুশকিলই হল এই। চোখে না দেখলে

তাঁরা সহজে কিছুই মানতে চান না। বল্‌লেন, তাই যদি হবে, তবে সূর্য যে সব উপাদানে তৈরী, মানে, সূর্যের মধ্যে যে সব জিনিস আছে, পৃথিবীতেও তার খোঁজ চাই। দিতে পার ভাল, নইলে রইল তোমার কথা, বিশ্বাস-ই করিনে!

প্রমাণের চেষ্টা চল্‌ল,—অক্লান্ত চেষ্টা। তারপরে আবিষ্কার হল এক অদ্ভুত যন্ত্র, নাম দেয়া হল তার স্পেক্‌ট্রোস্কোপ [Spectroscope]। এই যন্ত্র দিয়ে সূর্যের আলো ভেঙ্গে পরীক্ষা আরম্ভ হল। একে বলে বর্ণালী পরীক্ষা। প্রতিটি মৌলিক দ্রব্য গ্যাসীয় অবস্থায় এক একটা বিশেষ বর্ণ বা রং ধারণ করে। কোন দুটি মৌলিক দ্রব্যের বর্ণালী কখনও এক রকম হয় না। কাজেই জ্বলন্ত গ্যাস পিণ্ড, সূর্য থেকে ছুটে-আসা আলো নিয়ে চল্‌ল পরীক্ষা। পরীক্ষা করতে করতে প্রথমে ৩৬, তারপরে ৯২, আরও পরে ৯৭টা মৌলিক দ্রব্যের খোঁজ মিলল, যা নাকি পৃথিবীতেও আছে।

প্রমাণ-চাওয়ার-দল চুপ করে গেল।

এই বর্ণালী পরীক্ষা যে কত জটিল, কত দুরূহ, এই পরীক্ষায় যে কত মনীষা, কত ধৈর্য ও মনঃসংযোগ দরকার, তা তোমরা যতই বড় হবে ততই বুঝবে। বড় বড় পণ্ডিতেরা যখন এই পরীক্ষা নিয়ে হিম্‌সিম্ খাচ্ছেন, যা খুঁজছেন তা পাচ্ছেন না, অথচ পাওয়া চাই, তখন দুনিয়াকে অবাক্ করে দিলেন বাংলার এক ছেলে—ডক্টর মেঘনাদ সাহা। বহু নতুন

ও জটিল প্রশ্নের জবাব তিনি এনে দিলেন সূর্যের বুক চিরে। গ্যালিলিওর আবিষ্কারের পরে এত বড় আবিষ্কার বিজ্ঞান-জগতে আজ পর্যন্ত নাকি মাত্র গুটিকয়েকই হয়েছে। তাই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের আসরে ডক্টর সাহার আসন এত বড়।

এখন, এই যে মৌলিক পদার্থ, এর রূপ কখনও বদলায় না। যেমন সোনা একটা মৌলিক পদার্থ। তাকে যতই ভাঙ্গ, শেষ পর্যন্ত সে সোনা-ই থেকে যাবে। ভাঙ্গতে, ভাঙ্গতে, ভাঙ্গতে এমন এক অবস্থায় এসে দাঁড়াবে যখন তাকে আর ভাঙ্গতে গেলে 'পদার্থ' বলে কিছুই থাকবে না। অর্থাৎ পদার্থ নামে তাকে যদি ডাকতে চাও, তবে আর এতটুকু চোটও দিও না তাকে। পদার্থের এই অবস্থাকে বলে মলিকিউল বা অণু। এখন এই মলিকিউলকেও যদি ভাঙ্গতে চাও, তো সুরু কর ভাঙ্গতে। ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে এবার এমন জায়গায় এসে পৌঁছবে যাকে আর ভাঙ্গা যাবে না, অর্থাৎ সৃষ্টির শেষ বিন্দুতে তুমি পৌঁছে গেছ। একে ইংরেজ বলে এ্যাটম্, আমরা বলি পরমাণু, যার কতগুলির জটলায় গড়ে উঠে একটি মলিকিউল বা অণু। তবে মনে করনা যে, মৌলিক পদার্থ হলেই তাকে সোনার মত কঠিন পদার্থ হতে হবে। ওটা একটা উদাহরণ মাত্র। তরল বা গ্যাসীয় পদার্থও মৌলিক পদার্থ হতে পারে,—যাকে যতই ভাঙ্গ বা মার, স্বভাব তার বদলাবে না।

কিন্তু এই ৯৭টাই যদি দুনিয়ার সবকিছু হয় তবে এত জিনিস এলো কি করে ?

আগেই বলেছি, এদের যোগ-বিয়োগেই বাকি-গুলির জন্ম। তাদের বলা হয় যৌগিক পদার্থ। দুটো বা তারও বেশী মৌলিক পদার্থ একত্র হয়ে তৈরী হয় একটা যৌগিক পদার্থ। আর এমনি মজা যে, মিশে গিয়ে এরা এমনি চেহারা ও স্বভাব পেয়ে বসে যে কে বলবে এটা দুটো মৌলিক পদার্থের সমষ্টি ? কিন্তু জাত এদের ধরা পড়ে তখনই, যখনই আমরা এদের ভাঙ্গতে সুরু করি। ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে দেখা যায় এদের যা বলে জানতাম, তা-তো নয় ! জাত ভাঁড়িয়ে চেয়েছিল সমাজে মিশতে। যেমন হাইড্রোজেন ও অক্‌সিজেন নামে দুটো গ্যাস আছে। তারা দুজনেই মৌলিক। স্বভাব তাদের দুজনের একেবারে আলাদা। হাইড্রোজেন খুব হালকা গ্যাস। তাকে ধরে রাখা দায়। ফাঁক পেলেই উপরে উঠে যায়। আর একটু তাপ পেলেই দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে। আর অক্‌সিজেন বড় মিশুক গ্যাস। লোহার গায়ে লেগে মরচে ধরায়, কয়লার সাথে মিশে আগুন জ্বালায়। হঠাৎ কি-করে একদিন এদের হয়ে গেল ভাব। এমনি ভাবে মিশে গেল, চেনে কার সাধ্য। কিন্তু ওদের এই জাত ভাঁড়ানোতে পৃথিবী গেল বেঁচে,— পেল সে জল। জলের মধ্যে আছে দুই ভাগ হাইড্রোজেন ও এক ভাগ অক্‌সিজেন, বিজ্ঞানীর

ভাষায় H_2O। এই হল যৌগিক পদার্থ। মনে রেখ, এই যে মৌলিক পদার্থের যৌগিক রূপ-পরিবর্তন, এ কিন্তু খেয়াল-খুসী মত মিশালেই চলবে না। এর একটা বাঁধাধরা নিয়ম আছে, যার কম হলে মৌলিক পদার্থ যৌগিক রূপ নেবে না, আর যার বেশী হলে বেশীটুকু থাকবে পড়ে। তুমি যদি তিন ভাগ হাইড্রোজেন আর এক ভাগ অক্সিজেন মিশাও, তবে দেখবে, দুই ভাগ হাইড্রোজেন ও এক ভাগ অক্সিজেন মিলে জল তৈরী হয়েছে, আর এক ভাগ হাইড্রোজেন পড়ে আছে। আবার ওই হাইড্রোজেন-অক্সিজেনকেই একটু এদিক ওদিক করে মিশাও,—দুই ভাগ হাইড্রোজেন আর দুই ভাগ অক্সিজেন। এবার দেখবে, আর জল নয়। দাঁড়িয়েছে আলাদা একটা তরল পদার্থ, মাটিতে পড়লে ফস্ ফস্ করে ওঠে, ডাক্তাররা ঘা-পাঁচড়া ধুতে তাকে কাজে লাগান—হাইড্রোজেন-প্যারক্সাইড্—বিজ্ঞানের ভাষায় H_2O_2।

এই যে যৌগিক মিশ্রণ, এর থেকে কিন্তু মৌলিক পদার্থকে সহজে আলাদা করা যায় না। বিদ্যুতের সাহায্যে বিশেষ তাপে তাদের আলাদা করতে হয়। খানিকটা জলকে ঐ ভাবে বিদ্যুতের তাপ দিলে দেখবে, জল আর জল নেই,—দুটো গ্যাস আলাদা হয়ে উবে গেছে,—পাত্র তোমার খালি। এ যেন এক ভেল্‌কিবাজী।

এই যৌগিক মিশ্রণ ছাড়াও মৌলিক পদার্থের

আর এক রকম মিশ্রণ আছে। তাকে বলে সাধারণ মিশ্রণ। যৌগিক মিশ্রণের মত সাধারণ মিশ্রণে মৌলিক পদার্থ তার নিজের স্বভাব হারিয়ে ফেলে না,—এবং মূল-পদার্থগুলিকে আলাদা করতেও বেশী কষ্ট হয় না।

ধর, যেমন বালি আর চিনি মিশে গেল। মুখে দিলে বালিও টের পাবে, চিনিও। যদি ওদের আলাদা করতে চাও, গুলে ফেল জলে। চিনি যাবে গলে, আর বালি থাকবে পড়ে। তার পরে ছেঁকে নেও। ছাকনীতে বালি আট্‌কে থাকবে, আর জলেগোলা চিনি ছাকনী বেয়ে নীচে পড়বে। তার পরে সেই জল ফুটোলেই জল যাবে উবে, আর পেয়ে যাবে চিনি! এই হল সাধারণ মিশ্রণ।

বায়ু-ও এমনি একটি সাধারণ মিশ্রণ।

কাজেই জল ও বায়ু এ দু'টো এক জাতের নয়। দু'ভাগ অক্‌সিজেন ও চার ভাগ নাইট্রোজেন দিয়ে বায়ু তৈরী। এটা সকলের আগে প্রমাণ করেন ফরাসী বিজ্ঞানী অ্যান্তয়েঁ লরেন্ত ল্যাভয়সিঁয়ে। এ ছাড়া কার্বন-ডাই-অক্‌সাইড, জলীয় বাষ্প এবং আরও কতগুলি গ্যাস বায়ুর মধ্যে আছে। এদের অতি সহজেই আলাদা করা যায়। বায়ুর মধ্যে যে অক্‌সিজেন আছে তাতেই আগুন জ্বালায়। একটা মোমবাতি জ্বেলে একটা কোটো দিয়ে ঢেকে দাও, দেখবে ওটা নিভে গেছে। কারণ, বাতির সঙ্গে

অক্‌সিজেন মিশবার পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। জলে যেমন তার মূল-পদার্থগুলির অংশ সব সময়েই ঠিক সমান থাকে, বায়ুতে তা থাকে না। নদীর পাড়ে বা খোলা জায়গায় হাওয়াতে অক্‌সিজেন থাকে বেশী। আবার পৃথিবী ছেড়ে যতই উপরে উঠবে অক্‌সিজেন ততই কমে আসবে। কাজেই বায়ু জলের মত একটা যৌগিক পদার্থ নয়, এটাই প্রামাণ হল।

এই বায়ু সমুদ্র হতে আকাশে চারশো মাইলেরও উপর পর্যন্ত জুড়ে আছে, এ কথা আগেই জেনেছ। কিন্তু এতে এই বুঝায় না যে, এই সমস্ত জায়গা জুড়েই বায়ু এক অবস্থায় আছে। অর্থাৎ চারশো মাইল উপরের বাতাস আর তোমার ঘরের বাতাস একই রকম, এ কথা বুঝলে ভুল বুঝা হবে। দালানের যেমন একতলা, দুতলা, তিনতলা থাকে, বাতাসেরও তেমনি কতগুলি তলা বা স্তর আছে।

বাতাস পৃথিবীর যত কাছে ততই ঘন, আর যত দূরে ততই হালকা। পৃথিবীর পিঠ হতে আট-দশ মাইল পর্যন্ত বাতাসের প্রথম স্তর। এরই মধ্যে তার যত ছুটোছুটি দাপাদাপি, আর ঝড়-ঝাপটার তাণ্ডব। একে বলে ক্ষুব্ধস্তর। এর পরে চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত শান্ত স্তর। সেখানকার বাতাসে ছুটোছুটি নেই। ঠাণ্ডা হিম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এর উপরে হাইড্রোজেন ও অন্যান্য প্রকার গ্যাসের স্তর।

সেখানকার খবর এখনও ভাল ভাবে পৌঁছয়নি আমাদের কাছে।

যাঁরা বাতাসের এই স্তরগুলি পরীক্ষা করছেন, তাঁরা দেখেছেন যে, যতই ওপরে ওঠা যায়, বাতাস ততই ঠাণ্ডা, এবং ততই দম আটকে আসে। পৃথিবীর কাছাকাছি বাতাসে ধূলিকণা মেশানো থাকে, আর সেগুলিই সূর্যের তাপে তেতে ওঠে। এই কণাগুলি ভারী বলে বেশী উপরে উঠতে পারে না। তাই উপরের বাতাসে গরম নেই। আর দম আটকে আসে এই জন্য যে—বাতাস থেকে অক্সিজেন টুকুই শুধু আমরা টেনে নেই, আর বাকীটা ছেড়ে দেই। সেই অক্সিজেন পৃথিবীর কাছাকাছিই থাকে বেশী। যত উপরে ওঠা যায়, ততই সে কমে আসে। সেই জন্যই দেখছ উঁচু পাহাড়ে যারা ওঠে, পিঠে তারা বয়ে নেয় অক্সিজেনের থলে। দরকার হলে ওরা নল লাগিয়ে নেয় নাকে। এভারেষ্ট-জয়ী তেনজিং ও হিলারীর ছবি তো তোমরা দেখেছ, কি রকম অক্সিজেনের মুখোস-পড়া। তাও-তো এভারেষ্ট মাত্র পাঁচ মাইলের মত উঁচু।

কিছু আগে বলেছি যে, কোন মৌলিক পদার্থকে ভাঙ্গতে, ভাঙ্গতে, ভাঙ্গতে, ভাঙ্গতে এমন এক বস্তুতে এসে পৌঁছয় যাকে আর ভাঙ্গা যায় না, যার নাম দেয়া হয়েছে অ্যাটম্ বা পরমাণু। কথাটায় কিছু ভুল আছে।

এই পরমাণু-নামধারী পদার্থ বিন্দু এত ছোট যে

মানুষ অনেক কাল ভাবতেও পারেনি যে একেও আবার ভাঙ্গা যেতে পারে। যার দশ কোটি একত্র করলে মাত্র এক ইঞ্চি জায়গা জুড়ে থাকে, তাকে আবার ভাঙ্গা কি? আর এর পরেও আরও ক্ষুদ্র বস্তু থাকতে পারে সে আবার কি কথা? কিন্তু মানুষ বড় বেয়াড়া জীব। কোথাও সে থামতে চায় না,—কোন কথাকেই শেষ কথা বলে মানতে চায় না। 'চরৈবেতি, চরৈবেতি'—এগিয়ে চল, এগিয়ে চল, এই হল মানুষের চিরকালের কথা।

তাই চল্‌ল পরমাণু নিয়ে পরীক্ষা। সে কী দারুন তপস্যা! যে ক্ষুদ্রকে কল্পনাও করা যায় না,—তারও ক্ষুদ্রতম অংশ খুঁজে বার করতে হবে।

অবশেষে তপস্যা শেষ হল,—আবিষ্কার হল এক যন্ত্র, নাম তার সাইক্লোট্রোন। বড় জটিল তার গঠন,—তার চাইতেও অদ্ভুত তার কাজ। এমনি একটি যন্ত্র কলকাতায় আমাদের বিজ্ঞান কলেজে আছে। বড় হয়ে যখন বিজ্ঞান পড়বে তখন ওর কাজ-কারবার দেখে নিও।

আরম্ভ হল মানুষের পরমাণু ভাঙ্গবার সাধনা। তারপরে একদিন অবাক বিস্ময়ে বিজ্ঞানী দেখলেন, যা দেখলেন তা বিশ্বাস করে উঠতে পারলেন না। এ কি যাদু, ভেল্‌কি না আর কিছু! তিনি দেখলেন, ঐ যে পরমাণু, যার দশ কোটির ঠাসাঠাসিতে এক ইঞ্চি পরিমাপ, তার প্রতিটির ভিতরে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বিন্দুর

এ কী নাচন! একটা কেন্দ্রকে ঘিরে কতগুলি বিন্দুর সে কী তাথৈ-নাচন! ঠিক যেন কতগুলি ক্ষুদে সৌরজগৎ জুড়ে আছে একটা পরমাণুতে। কোথাও বেতাল নেই,—কোথাও তালকেটে-যাওয়া নেই,—কারুর সাথে কারুর ধাক্কা-ধাক্কি নেই—নাচছে, কেবলই নাচছে। বিজয়ী বিজ্ঞানী তখন সবাইকে ডেকে জানিয়ে দিলেন,—শোনো, শোনো যা জেনেছিলে এতদিন তা ঠিক নয়, সৃষ্টির শেষ কথা এ্যাটম্ নয়,—আরও ছোট, আরও খুদের খোঁজ আমরা পেয়েছি,—যার বহুর একত্রে একটি এ্যাটম্।

এরা হল অতি-পরমাণু, প্রোটোন, ইলেকট্রন যাদের নাম। এ যে কি বস্তু তা বলে বুঝাবার চেষ্টা বৃথা। তবুও বলছি শোনো।

প্রত্যেকটি পরমাণুর একটা করে কেন্দ্র আছে,—যাকে বলে, ন্যুক্লিয়স্,—ফলের যেমন শাঁস। এখানে থাকে প্রোটোন কণিকা। আর তার চারদিকে ডিমের মত পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে যারা, তারা হল ইলেকট্রন কণিকা। এ যেন সূর্যের সংসার—ঘিরে আছে সব গ্রহের দল। আবার এখানেও সেই ধরবার আর পালাবার খেলা। প্রোটোন বলছে—ধর-ধর-ধর, ইলেকট্রন বলছে—পালা পালা-পালা। পালাতে গিয়ে ইলেকট্রন কণিকা কি বেগে ছোটে জান? সেকেণ্ডে প্রায় হাজার মাইলেরও বেশী। কাজেই এই টানাটানি আর ছুটোছুটির ফলে প্রোটোন

পারেনা ইলেকট্রনকে টেনে নিতে, আবার ইলেকট্রনও পারেনা ছুটে বেরিয়ে যেতে। ফলে সৌরজগতের মত খুদে-জগৎ গড়ে উঠেছে প্রতিটি পরমাণর অন্তরে।

এই প্রোটোন ও ইলেকট্রনের অনেকগুলির জটলায় গড়ে ওঠে একটি এ্যাটম্। আবার বহুতর এ্যাটমের জটলায় একটি মলিকিউল। আবার অসংখ্য মলিকিউলের সমাবেশে একটি মৌলিক দ্রব্য।

কাজেই এই দুনিয়ায় যা কিছু দেখছ তার শেষ কথা হল ঐ প্রোটোন আর ইলেকট্রন। তবে ভেব না, প্রত্যেক বস্তুরই প্রোটোন-ইলেকট্রনের সংখ্যা এক। বস্তুর জাত ভেদে এই সংখ্যার প্রভেদ হয়।

মনে রেখ, একটি প্রোটোন কণা একটি মাত্র ইলেকট্রন কণাকেই বশে রাখতে পারে। পরমাণু কেন্দ্রে প্রোটোন কণা যত বেশী হয় তত বেশী ইলেকট্রনকে তারা শাসনে রাখে। পরমাণু-কেন্দ্রের প্রোটোন-ইলেকট্রনের সংখ্যা দিয়ে পরমাণুর "এ্যাটমিক্ নম্বর' স্থির হয়।

'এ্যাটমিক নম্বর' আবার কি ?

তুমি, আমি, আমরা, মানুষ তো সবাই। কিন্ত আমাদের ব্যক্তিগত পরিচয় কি ? তুমি যে আমি নও, আর আমি যে তুমি নই, সেটা বোঝানো কি করে ? সেটা বোঝাবার জন্যই তো জন্মের পরে বাপ-মা আমাদের নাম রাখেন,—আর এই জন্যই তো পরীক্ষার খাতায় রোল নম্বরের ব্যবস্থা। বলছি তো

'এ্যাটম্'। কিন্তু সব এ্যাটম্ই কি এক? যেমন সব বস্তু এক নয়। তবে তাদের চিনব কি করে? চিনব, হয় নাম দিয়ে, না হয় নম্বর দিয়ে। নাম দিয়ে সব সময় চিনবার স্থবিধে হয় না। কত নাম আর মনে রাখা যায় বল? আর একই নামের তো কত লোকই থাকে। তাই এ্যাটম্দের চিনবার জন্য কতকগুলি নম্বর ঠিক করা হয়েছে। যেমন হাইড্রোজেন গ্যাসের পরমাণু কেন্দ্রে আছে একটি প্রোটোন আর একটি ইলেকট্রন। তাই ওর নম্বর হয়েছে এক। হিলিয়ামে আছে হু'টি করে, তাই ওর নম্বর হুই। এই করে ৯২ এ্যাটমিক্ নম্বর দাঁড়িয়েছে ইউরিনিয়ামের।

ওদিকে আর একটি খবর পাওয়া গেছে। পরমাণু কেন্দ্রকেও নাকি ভাঙ্গা যায়। তাকে ভেঙ্গে পাওয়া গেল প্রোটোন ছাড়া আরও হু'রকম কণিকার সংবাদ। তাদের নাম রাখা হল ন্যুট্রন আর পজিট্রন। পজিট্রন ওজনে ইলেকট্রনের সমান, কিন্তু পালিয়ে বেড়ায় না তার মত, প্রোটোনের মত আকর্ষণ করে। আবার ন্যুট্রনের কোন ধর্ম-ই নেই। সে হাঁ-ও নয়, না-ও নয়, ওই একরকম! সে না পারে প্রোটোনের মত টানতে, না পারে ইলেকট্রনের মত ঠেলতে। সে কেবল প্রোটোনের সাথী—আছে— এই পর্যন্ত। ওজন কিন্তু তার প্রোটোনেরই মত।

প্রোটোন-ইলেকট্রনের এই যে খুদে সৌরজগৎ, এখানে প্রতিটি কণিকার মধ্যে ফাঁক কত জান?

সূর্যের সাথে গ্রহদের, আবার গ্রহে গ্রহে যে দূরত্বের কথা তোমরা আগেই শুনেছ, প্রোটোনে ইলেকট্রনে, আর ইলেকট্রনে ইলেকট্রনে দূরত্ব তার চাইতে বেশী ছাড়া কম নয়। এটা অবশ্য তাদের আয়তনের অনুপাত অনুসারে। এই সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা দিতে গিয়ে একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী বলেছেন—হাওড়ার মত মস্ত বড় ষ্টেশন থেকে অন্য সব কিছু সরিয়ে নিয়ে কেবল গোটা পাঁচ ছয় বোলতা ছেড়ে দিলে যে অবস্থা হয়, পরমাণুর অন্তরে অতি-পরমাণুদের অবস্থাও ঠিক তেমনি। এদের পরস্পরের দূরত্ব এত বেশী বলেই সৃষ্টি টিকে আছে। তা না হলে পরমাণু জগৎ বিলুপ্ত হয়ে যেত,—আর পরমাণু দিয়ে গড়া এই বিশ্ব-জগতের চিহ্ন-ই খুঁজে পাওয়া যেত না।

একবার চোখ বুজে ভাল করে তাকিয়ে দেখতো—

৯৭টা মৌলিক পদার্থে গড়া এই বিশ্বজগৎ। যে কোন একটা বেছে নাও। ভাঙ্গতে সুরু কর। ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে প্রথমে এলো অণু—মলিকিউল। তাকে ভাঙ্গলে, পেলে পরমাণু—এ্যাটম্। তাকেও আবার ভাঙ্গলে—পেলে এবার অতি-পরমাণু—প্রোটোন, ইলেকট্রন ইত্যাদি।

কী বিরাট বিস্ময়! কি বিপুল রহস্য! কে সেই কবি, যাঁর কল্পনায় রূপ পেয়েছিল এই সৃষ্টি? কে সেই শিল্পী, যাঁর যাদুস্পর্শে গড়ে উঠল এই বিশ্ব?

ওই যে শেয়ালটা ডাকল, যে উঁইপোকা তোমার বই কাটল, যে মশাটা তোমার গাল কামড়ে দিল, যে ঢিলটা তুমি আকাশে ছুঁড়লে, যে ফুলের পাঁপড়িটি ঝরে পড়ল, ঐ যে দু'ফোটা বৃষ্টি পড়ল, আর হু-হু করে বাতাস ছুটে এলো, এর সব কিছুরই শেষ কথা হল প্রোটোন আর ইলেকট্রন! যতক্ষণ এদের নাচের তালে কেউ বাধা দেয় না,—ততক্ষণ সব কিছুই ঠিক আছে বলে মনে হয়। আর যখনই কোথাও গোলমাল বেঁধেছে দেখবে,—খাপছাড়া ভাব,—ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত তেমনটি নয়,—তখনই বুঝবে এদের নাচের তাল কেটেছে,—কেউ খুঁচিয়ে এদের রাগিয়ে দিয়েছে। ইলেকট্রনদের নিয়ম হল, আঘাত পেলেই চঞ্চল হয়ে ওঠে, আর চঞ্চল হলেই তাপ বিকিরণ করতে করতে ছুটে পালাতে চায়। আর ইলেকট্রনের কমতি পড়লেই প্রোটোনের আকর্ষণ ওঠে বেড়ে,—তার মেজাজ যায় বিগড়ে।

প্রমাণ চাও?

এক টুক্‌রো রেশমের কাপড় দিয়ে একখানা কাঁচকে আচ্ছা করে ঘষে দাও। তারপরে সেই রেশমের টুকরোকে কাঁচের কাছে এগিয়ে নাও। দেখবে চুম্বকের ধর্ম জেগেছে কাঁচের বুকে। অর্থাৎ কাঁচ টেনে নিচ্ছে রেশমের টুকরোকে।

এটা হল কেন?

ঘষাঘষির ফলে খানিকটা ইলেকট্রন এসে লেগে

গেল রেশমে। কাঁচের অন্তরে ইলেকট্রনের পড়ল কমতি। সঙ্গে সঙ্গে প্রোটোনের তেজ উঠল বেড়ে। তারা চঞ্চল হয়ে উঠল—বল্‌ল,—ঘর ভাঙ্গে কেরে? ফিরে দে আমার ইলেকট্রন কণাকে। ওদিকে পালিয়ে-আসা ইলেকট্রনের মনেও শান্তি নেই। সে ফিরে যেতে চায় ঘরে,—ফিরে চায় শান্তি। তাই দুজনকে যেই কাছে নেয়া, প্রোটোন দিল টান, আর ইলেকট্রন দিল ঝাঁপ। ইলেকট্রন ফিরে গেল নিজ ঘরে। প্রোটোনের মেজাজ হল শান্ত। এই যে এত বড় ব্যাপারটা ঘটে গেল, তা আমরা দেখলাম শুধু কাঁচ আর রেশমের শাঁটাশাঁটিতে।

একটু আগেই বলেছিলাম যে দুনিয়ার শেষ কথা হল প্রোটোন আর ইলেকট্রন [পজিট্রন ও ন্যুট্রন সহ]। এদেরই জটলায় গড়ে উঠেছে যত মৌলিক দ্রব্য, রূপ যার কখনো বদলায় না।

একদিন কিন্তু জানা গেল, এদের-ও রূপ পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব। প্রতিটি মৌলিক দ্রব্যের এ্যাটমের অন্তরের প্রোটোন সংখ্যা এক নয়; এবং এক নয় বলেই তারাও এক নয়, চেহারা ও স্বভাবে। ঐ প্রোটোন সংখ্যাই ঠিক করে দেয়, কোনটা সোনা, কোনটা পারা বা অন্য কিছু। একদিন বেয়াড়া-মানুষের খেয়াল চাপলো মৌলিকের বুকে ঘা মেরে প্রোটোন সংখ্যা কম-বেশী করে দিয়ে দেখা যাক না কি হয়! দেখা গেল অবাক কাণ্ড! মৌলিক আর

মৌলিক নেই, সে চেহারা পালটাচ্ছে। সেইদিন থেকে মৌলিকের জাত গেল মারা!

কিন্তু এখানে শেষ হলেও মৌলিকের মান হয়-তো কিছুটা বাঁচতো!

আর এক দিন আর-ও আশ্চর্য খবর পাওয়া গেল যাতে 'মৌলিক' পদবীটা এখন প্রায় মিছে হয়ে দাঁড়িয়েছে! খবর পাওয়া গেল, এদের এই রূপ-পরিবর্তন মানুষের চেষ্টার অপেক্ষা রাখে না। আপনাতেই হয়ে চলে, অতি ধীরে, অতি গোপনে। তখনকার দুনিয়ায় এটা একটা জবর খবর। বিজ্ঞানী মহলে হুলস্থূল পড়ে গেল। ফরাসী বিজ্ঞানী হাঁরী বেকরেলের গবেষণায় জানা গেল কিছু খবর। তারপরে তাঁর ছাত্রী ম্যাডাম কুরী ও তাঁর বিজ্ঞানী স্বামী পিচ্‌ব্লেণ্ড নামে একরকম খনিজ পদার্থ নিয়ে অনেক গবেষণা করলেন। তার ফলে আমরা জানতে পেলাম যে পৃথিবীতে ৪০টি এমনি জাত-খোয়ানো মৌলিক দ্রব্য আছে,—ইউরিনিয়াম, রেডিয়াম, পলোনিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি। আর এরা জাত খোয়াচ্ছে ইচ্ছা করে নয়, বড় দায়ে পড়ে। এদের পরমাণু-কেন্দ্রের প্রোটোনগুলি সাধারণের চাইতেও বেশী ভারী। আর সেখানে ভীড় জমিয়েছে কতগুলো ন্যুট্রন কণিকা। তাই ভার সামলাতে না পেরে ক্রমাগত তেজ বিকিরণ করছে, আর ইলেকট্রনের মূলধন খোয়াচ্ছে। আর তারই ফলে এই রূপ-পরিবর্তন।

এই ধাতুগুলিকে বলে তেজস্ক্রিয় বা রেডিও-এ্যাক্‌টিভ দ্রব্য। [এ্যাটম্‌ আর হাইড্রোজেন বোমার কল্যাণে আজকাল Radio Active কথাটা খুবই শোনা যাচ্ছে, তাই জেনে রাখা ভাল]।

এই রেডিও-এ্যাক্‌টিভ পদার্থের আবিষ্কারে আমরা আরেক ভাবে অশেষ উপকৃত হয়েছি।

দেখা গেছে, এদের রূপান্তর ঘটে একটা বাঁধা গতিতে। সেই গতির হিসাবে এক টুক্‌রো ইউরিনিয়াম ৫00 কোটি বৎসরে অর্ধেক সীসায় রূপান্তরিত হয়। এই হিসাবে দেখা গেছে পৃথিবীর বয়স এখন দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩৪0 কোটি বৎসর। হিসাবটা সঠিক না হলেও সঠিকের প্রায় কাছে বলা চলে! তবে মোটামুটি ভাবে পৃথিবীর বয়স ধরা হয় ২00 কোটি বৎসর।

এখন বাতাসের মধ্যে এদের কাজ কি রকম দেখ।

কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ মার মার কাট্‌কাট্‌। ঝড় এলো ছুটে। বাড়ী ঘর উড়ে গেল,—বড় বড় গাছ ভেঙে পড়ল, মানুষ মরল, পশু মরল, পাখী মরল,—তারপরে আবার সব চুপ।

এটা হলো কেন?

সূর্যের তাপে মাটি গরম হয়ে মাটির প্রোটোন ইলেকট্রনদের দিল খেপিয়ে। মাটি তার তাপ ছেড়ে দিল বাতাসে। ফলে বাতাসের ইলেকট্রন-প্রোটন দল গেল চটে। লেগে গেল তাদের রাজ্যে হুলস্থূল। গরম হয়ে তারা ছুটে চল্‌ল উপর দিকে। বাতাসে হয়ে গেল একটা

গর্ত। কিন্তু এ দুনিয়ায় কোন জায়গাই ফাঁকা থাকতে পারে না। বাতাসের হেড অফিসে খবর গেল। কি সর্বনাশ, বাতাসে গর্ত! হুকুম হল, গর্ত বোজাও। এখুণি বোজাও। হু হু করে নেমে এলো ঠাণ্ডা বাতাস, উপর থেকে,—আবার তার জায়গায় অন্য বাতাস, আরও উপরের, তারপরে আর-ও, তারপরে আর-ও। এদিকে প্রথম-আসা ঠাণ্ডা বাতাস পৃথিবী ছুঁয়েই দে ছুট আকাশে। এমনি করে চল্‌ল আকাশ-পৃথিবী মাঝে বায়ুর একটা চড়কি স্রোত। এই তোলপাড়ে বায়ুর ক্ষুদ্রন্তর চঞ্চল হয়ে উঠল। আরম্ভ হল ঝড়। চৈত্র-বৈশাখ মাসেই এরকম ঝড় বেশী দেখা যায়। এই ঝড়কে কালবৈশাখী বলে।

কাজেই দেখছ, সূর্যের তাপে বাতাসের প্রোটোন ইলেকট্রনের দল তেতে না উঠলে ঝড় হত-ই না!

এখন এই বাতাস, যার কথা বলতে বলতে পরমাণু, অতি-পরমাণুর গভীর অরণ্যে ঢুকে পড়েছিলাম, সে কত কাজ করে দেখ।

আগেই জেনেছ বাতাস না হলে আগুন জ্বলত না। কারণ বাতাসের অক্‌সিজেন পৃথিবীর কার্বন বা অঙ্গারের সঙ্গে যোগ হয়ে আগুন জ্বালায়। তাছাড়া বাতাস বাঁচিয়ে রেখেছে পৃথিবীতে জীব উদ্ভিদ্, সব কিছুকে। জীব বা উদ্ভিদ্ সবাইর দেহে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে কার্বন নামে একটা পদার্থ থাকে। জীব যখন শ্বাস টানে তখন বাতাস থেকে কেবল মাত্র

অক্‌সিজেনটুকুই গ্রহণ করে। এই অক্‌সিজেন দেহের কার্বনের সঙ্গে মিশে কার্বন-ডাই-অক্‌সাইড নামে একটা গ্যাস তৈরী হয়ে নাক দিয়ে বেরিয়ে আসে। এইভাবে ধীরে ধীরে বাতাসের অক্‌সিজেন যায় কমে, আর কার্বন-ডাই-অক্‌সাইডে বাতাস ওঠে ভারী হয়ে। প্রাণীদের পক্ষে এটা বড় মারাত্মক। শীতের দিনে ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ করে লেপ মুড়ি দিয়ে শুলে কিরকম একটা দম-আট্‌কা ভাব মনে হয় না? ওটা হয়, কারণ বন্ধ ঘরের অক্‌সিজেনের পুঁজিটুকু টেনে টেনে প্রায় শুষে নিয়েছ,—আর ঘর ভরে উঠেছে তোমার ছেড়ে দেওয়া কার্বন-ডাই-অক্‌সাইডে। বেশীক্ষণ এভাবে থাকলে মারা যাওয়াও অসম্ভব নয়।

কিন্তু বাতাসের অক্‌সিজেন তো এই ভাবে ফুরিয়ে যাওয়ার কথা! তবে আমরা বেঁচে আছি কি করে? —বলি।

অক্‌সিজেন নিয়ে তো কার্বন-ডাই-অক্‌সাইড দিলাম ছেড়ে। আমাদের কাছে তা বিষ হলেও গাছ-গাছালির কাছে তা কিন্তু অমৃত। অর্থাৎ, তারা তক্ষুণি টেনে নেয় কার্বন-ডাই-অক্‌সাইডকে, আর ফিরিয়ে দেয় অক্‌সিজেন। এই ভাবেই বাতাসে অক্‌সিজেন ও কার্বন-ডাই অক্‌সাইডের কমতি পড়েনা কখনও। আমরা যা ছেড়ে দেই, গাছ তা টেনে নেয়, আবার গাছ যা ছেড়ে দেয়, আমরা তা টেনে নেই। গাছপালা আমাদের যে সব উপকার করে তার মধ্যে এই

একটি প্রধান। এই জন্যই বাড়ীর কাছে-পিঠে গাছপালা জন্মানো ভাল।

তারপরে বাতাসের আরও অনেক কাজ। দুনিয়ার খবর চালাচালি কাজের সেই হল পিয়ন। বাতাসের মধ্যে বিদ্যুতের ঢেউ বইছে সব সময়, ছোট বড়, নানা রকমের। এই ঢেউগুলিই যত শব্দ সব পিঠে বয়ে তোমার আমার কাছে পেঁৗছে দেয়। তুমি বলছ, আমি শুনছি। এ সম্ভব হত না যদি না বাতাস থাকত। আরও অবাক হয়ে যাই, যখন দেখি হাজার হাজার মাইল দূরের কথা ভেসে এসে ধরা পড়ছে আমার রেডিও-যন্ত্রে। তখন পরম বিস্ময়ে বাতাসকে নমস্কার জানাই। বায়ু-তরঙ্গে শব্দ-চলাচলের এই সংবাদ যিনি আমাদের প্রথম দিলেন, তিনি আমাদেরই ঘরের ছেলে—আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু। আজিকার রেডিও যন্ত্র আবিষ্কারের গোড়ায় তাঁর দান অসামান্য। তারপর ইটালী দেশের বিজ্ঞানী মার্কনীর হাতে এই যন্ত্র আজিকার পূর্ণতা পেলো। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার যখন প্রথম প্রচারিত হল, তখন ফরাসী বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি এক পত্রে তাঁকে লিখেছিলেন—

"আপনার অপূর্ব আবিষ্কার বিজ্ঞানের জ্ঞানকে বহুদূরে এগিয়ে নিয়েছে। আপনার প্রাচীন পূর্বপুরুষরা ছিলেন সেই সময়কার মানব-সভ্যতার অগ্রণী। বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যার উজ্জ্বল আলোকে তাঁরা জগতকে

আলোকিত করেছিলেন। আপনি তাঁদের গৌরব কীর্ত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করুন।”

এ-যে আমাদের কত বড় গৌরবের কথা তা বলে শেষ করা যায় না। আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষদের জ্ঞানের আলোকে একদিন পৃথিবী আলোকিত হয়েছিল। আমাদের অশেষ দুর্ভাগ্য যে তা নিয়ে আজ আমরা কোন আলোচনা করি না, বিদেশীরা তো না-ই। তাঁদের বংশধর হিসেবে সেই সব লুপ্ত-কীর্ত্তি উদ্ধার করার মহান কর্তব্য আমাদেরই, একথা মনে রেখ!

বাতাসের আর এক কাজ আলো বিছিয়ে দেয়া। তোমরা দেখছ রোদ যেখানে নেই, সেখানে ছায়াতেও আলো আছে। এ কাজটিও করছে বাতাস। বাতাস না থাকলে শুধু রোদ-পড়া জায়গাটাই হত আলো,—আর বাকী-সব অন্ধকার,—ছাদের' পরে তালু-ফাটা রোদ, আর ঘরের মধ্যে ঘুট্‌ঘুটে্ অন্ধকার। তাছাড়া এই রোদ বিছাতে গিয়ে বাতাস রোদের তাপকেও ছড়িয়ে দেয়। তা না হলে যে জায়গায় রোদ পড়ত, সে জায়গা পুড়ে ছারখার হয়ে যেত।

বাতাসের মধ্যে জলীয় বাষ্প, অক্‌সিজেন, কারবলিক এ্যাসিড প্রভৃতি গ্যাস ছাড়াও নাইট্রোজেন নামে একটা গ্যাস আছে। এটা গাছপালার একটা প্রধান খাদ্য। বায়ুমণ্ডলের এই নাইট্রোজেন জমিকে উর্ব্বর করে এবং উদ্ভিদ জগতকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। বজ্র বা বাজ বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনকে অন্যান্য গ্যাস থেকে

পৃথক করে দেয়, আর বৃষ্টি এসে সেই নাইট্রোজেনকে মাটিতে নামিয়ে আনে। এইভাবে আকাশের নাইট্রোজেন পৃথিবীকে উর্বর করে।

আরও দুটো কাজ করছে বাতাস, সেও বড় কম নয়। পৃথিবীর যত তাপ, সব পাঠিয়ে দিচ্ছে উপরে। আবার উপরের ঠাণ্ডা বাতাসকে ঠেলে রাখছে নীচ থেকে, যাতে সে ঝপ্ করে নীচে নেমে আসতে না পারে। যে গ্রহে বাতাস নেই, সে গ্রহে প্রাণও নেই। অবস্থা তার বড়ই কাহিল। যেমন চাঁদ। চাঁদে বাতাস নেই, তাই সূর্যের তাপে সে তেতে পুড়ে ওঠে, আবার গ্রহণের ছায়া পড়লেই ঠাণ্ডা হিম হয়ে যায়। বাতাস নেই বলে চাঁদে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত নেই।

বাতাস যে কেবল একটা কম্বলের মত আমাদের পৃথিবীকে জড়িয়ে রেখেছে, তাই নয়। পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবাইর সঙ্গে বাতাস প্রাণের বন্ধনে বাঁধা। বাতাস না থাকলে বৃষ্টি হত না, শিশির পড়ত না, কুয়াসা হত না। আর এসব না হলে বাতাস পরিষ্কার হত না, ময়লা বাতাসে শ্বাস টেনে আমাদের অসুখ হত; পৃথিবী সুজলা হত না, মাটি সরস হত না, উদ্ভিদ জন্মাত না, আমরা বাঁচতাম কি করে?

এই আমাদের পৃথিবী। জন্মের পরে আজ তার বয়স দুশো কোটি বছর হতে চল্‌ল। তবু আজও তার যৌবনে পৌঁছয়নি। ভাঙ্গাগড়া শেষ হয় নি। পঞ্চাশ কোটি বছর আগে যে জীব পথিবীতে প্রথম

এসেছিল, আজ তিন লক্ষ বছর মাত্র আগে সে প্রথম মানুষের রূপ পেল। এই তিন লক্ষ বছরের সাধনার ফল আজিকার মানুষ,—তুমি, আমি, আরও কতো। কী করে, কীভাবে, কোন্ রহস্যময় পথের কিনারা বেয়ে পৃথিবীর বুকে প্রাণের জয়-যাত্রা সুরু হল,—সেই কথাই বলব এখন।

আট

প্রাণ

যে শান্ত, সুন্দর পৃথিবী অগণিত সন্তান বুকে নিয়ে আপন মনে সূর্য প্রদক্ষিণ করছে, তার জন্ম-ক্ষণের রূপ তো আমরা দেখেছি। কী দাপাদাপি, কী মাথা-কোটাকুটি, কী ভয়ঙ্কর ফুঁসে-ফেঁপে-ফুলে ফেটে পড়া, তেজের কী দুর্দান্ত দুরন্তপনায় মেতে ছিল সেই শিশু পৃথিবী! একদিন নয়, মাস-বছর নয়, প্রায় দেড়শো' কোটি বছর ধরে চলেছিল এই মাতামাতি। তারপরে, দুরন্তপনা যখন কিছুটা থেমে এলো, আলোহীন কালো এক আঁধার রাতে সমুদ্রের গরম বুকে শোনা গেল প্রাণের প্রথম স্পন্দন,—প্রোটোপ্লাজম্ তার নাম। আদি-জ্যোতি নীহারিকাকে কেন্দ্র করে আকাশে

যেমনি ফুটে উঠেছিল তারার মেলা, আদি-প্রাণ প্রোটো-প্লাজম্‌কে কেন্দ্র করে পৃথিবীতে-ও স্বরু হল প্রাণের খেলা। সেই যে স্বরু হল, আজও তা বয়ে চলেছে—প্রাণ হতে প্রাণে, গাছ থেকে ফুল, ফুল থেকে ফল ফল থেকে আবার গাছ, পিতা হতে সন্তানে; এক থেকে বহু, বহু থেকে বহুতরো,—প্রাণের চাকা ঘুরছে, ঘুরছে আর ঘুরছে!

কিন্ত কোথা হতে এলো এই প্রাণ, যার এতটুকু আভাস-ও পাইনি সেই শিশু পৃথিবীর বুকে? প্রাণ-হীন জড় পৃথিবীর বুকে ছোট্ট একটি ভীরু প্রাণ কি করে এসে দানা বাঁধল, সে জিজ্ঞাসার আজ-ও কোন উত্তর মেলেনি। সে পরম-বিস্ময়ের মতই রয়ে গেল।

প্রাণ কি করে এলো তা আমরা না জানলেও কোথায় প্রথম প্রাণ এসেছিল তা জেনেছি।

প্রোটোপ্লাজমের দেহের ঠিক মাঝখানটায় ফুট্‌কিমত একটি মাত্র বিন্দু থাকত। ওটা-ই ওর প্রাণকেন্দ্র। দেহে ঐ একটি মাত্র কোষ সম্বল করে, কত ভয়ে, কত সাবধানে সেদিনের দুরন্ত পৃথিবীর বুকে সে যাত্রা শুরু করেছিল। আকারহীন, লালাময় সেই প্রথম প্রাণী মাঝে মাঝে ঠিক মাঝখান দিয়ে সরু হতে হতে দুই ভাগে ভাগ হয়ে যেত, আর মাঝের সেই বিন্দুটাও খানিকটা এদিক খানিকটা ওদিকে কেটে যেত। এইভাবেই চলত তার বংশ বৃদ্ধি।

এদের সম্বন্ধে এর চাইতে আর বেশী খবর যোগাড়

করা যায়নি। কারণ গায়ে হাড়গোড় ছিল না বলে পৃথিবীর বুকে এরা কোন চিহ্ন রেখে যেতে পারেনি।

তারপরে সূর্যের আলো পড়ল পৃথিবীতে এবং সঙ্গে
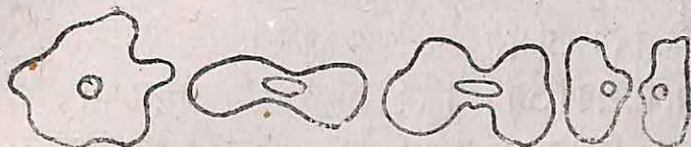
সঙ্গে পৃথিবীর চেহারা গেল বদলে। এই সময় থেকেই পৃথিবীতে জীবনের ক্রমবিকাশের মোটামুটি একটা হিসেব পাওয়া গেছে।

কি করে, শোনো—

আজ যে মাটি দেখছ, লক্ষ লক্ষ বছর পরে হয়তো তা পাথর বনে যাবে,—যেখানে ছিল পাহাড়, সেখানে হবে সমুদ্র, আবার কোথাও হয়তো সমুদ্রের জল যাবে শুষে, আর ঠেলে উঠবে পাহাড়। এখন, এই মাটির মধ্যে যে সব জীব, তাদের হাড়গোড়, গাছপালা আর সমুদ্রের জলে যে সব জীব, যাদের হাড়গোড় পচা সম্ভব নয়—সব ওই সাথে জমে, কেউ-বা কঠিন পাথর হয়ে থাকবে, কেউ বা মাটির বুকে ছাঁচের মত ছাপ রেখে যাবে। তারপরে, লক্ষ বছর পরে যদি কেউ জানতে চায়, লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে কি রকম সব প্রাণী ছিল, তা হলে ওর থেকেই তার উত্তর মিলবে।

সুতরাং পৃথিবীর পাহাড়-পর্বতগুলিকে আমরা একখানা বই বলতে পারি।

যাদুঘরে যদি যাও,—বেশী দূর নয়,—এই

কলকাতার যাদুঘরেই একবার ঘুরে এসোনা,—দেখবে কত বড় বড় ভীষণ চেহারা-ওলা জন্তু-জানোয়ারের হাড়গোড় সব সাজানো আছে। তারা এত প্রাচীনকালে জন্মেছিল যে তাদের হাড়গোড় আমরা কিছুতেই পেতাম না যদি প্রকৃতির নিয়মে তারা পাথর বনে না যেত। আবার দেখবে, কত পোকা, গাছের পাতা, যেমনটি ছিল ঠিক তেমনটি পাথর বনে গেছে। সব চাইতে অবাক হবে বেমালুম পাথর বনে-যাওয়া মস্ত একটা গাছ দেখে। এরাই হল আমাদের পাথরের বই-এর এক একটি ছেঁড়া পাতা। ইংরাজীতে এদের ফসিল [Fossil] বলে।
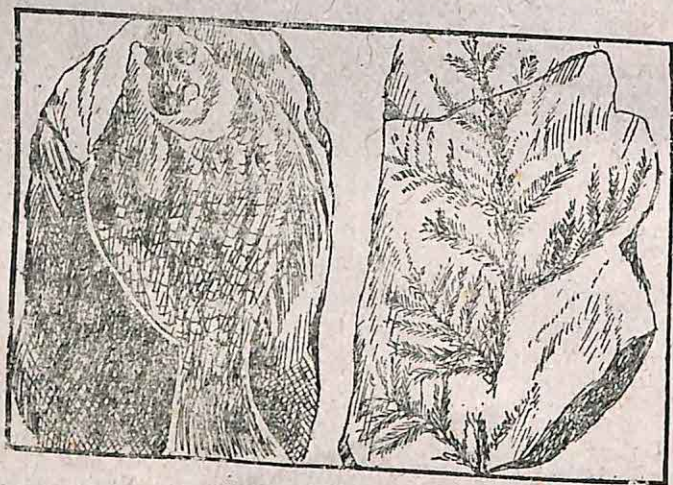
ছাঁচের মত ছাপ রেখে যাবে

এমনি ধারা এখানে ওখানে খুঁজে-পাওয়া টুক্‌রো পাতা কুড়িয়ে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীতে জীবনের ক্রম-বিকাশের একটা ইতিহাস লিখেছেন। সে লেখা

এখনও শেষ হয়নি। নতুন নতুন ফসিল রোজই পাওয়া যাচ্ছে। তাই তার পাতায় পাতায় কাটাকুটি চলছে ক্রমাগত। কিন্তু এ পর্যন্ত যেটুকু লেখা হয়েছে, তাতে দেখতে পাবে, কি করে পৃথিবীর বুকের অতি নগণ্য প্রাণী ধাপে ধাপে উন্নীত হয়ে শ্রেষ্ঠ জীব, মানুষ হয়ে দাঁড়াল।

নয়

যাত্রা হল সুরু

ধাপে ধাপে প্রাণ এগিয়ে চল্‌ল, ধাপে ধাপে আমরা যেমন সিঁড়ি বেয়ে উঠি। প্রাণের যাত্রা হল সুরু!

প্রথম ধাপের খবর তোমরা জেনেছ। দেহে হাড় ছিল না বলে পৃথিবীর বুকে তারা কোন খবর রেখে যেতে পারেনি।

এর পরের ধাপে যারা, তারা এলো পৃথিবীতে সূর্যের আলো পড়বার পরে। পাহাড়ের গায়ে, পাথরে বা শক্ত মাটিতে আমরা এদের খোঁজ পাই। সূর্যের আলো, আর পৃথিবীর জল, এই ছিল এদের সম্বল। গুগ্‌লি গোছের ছোট ছোট পোকা, কাঁকড়া, আর এক রকম জলজ উদ্ভিদ,—এরাই ছিল তখনকার শ্রেষ্ঠ প্রাণী। তাদের

দেহের শক্ত খোলগুলিই মাটির বুকে সাক্ষী রেখে গেছে। এরা-ও কিন্তু জল ছেড়ে উপরে উঠতে পারত না।

তৃতীয় ধাপ—এখানে এলে দেখা যায় যে আগের ধাপের প্রাণীদের অনেক উন্নতি হয়েছে। চেহারা হয়েছে অনেক বড়, আর দেহের খোলও হয়েছে অনেক শক্ত ও পুরু। প্রকাণ্ড বড় বড় কাঁকড়া, ইয়া-ইয়া গুগ্‌লি, আর আট-দশ হাত লম্বা মাছ আর বিছা। তারাই ছিল তখনকার শ্রেষ্ঠ জীব।

হাজার হাজার বছর কেটে গেল, জলের মধ্যে আরও অনেক প্রাণী দেখা দিল। কিন্তু মজা হল, জল ছেড়ে

জলের মধ্যে আরও অনেক প্রাণী দেখা দিল

এরা কেউ উঠতে পারত না ডাঙ্গায়। আর যদিও বা কখনও উঠে পড়ত, অমনি দম আট্‌কে মরে যেত। আজও এমন অনেক জলের প্রাণী দেখা যায় যাদের ডাঙ্গায় তুল্‌লেই মারা যায়।

আমরাও কি জল ছাড়া বাঁচতে পরি? গাছপালা পশু-পাখীও কি পারে? তবে তফাৎ এই, মাঝে মাঝে জল খেলেই স্বচ্ছন্দে আমরা বেঁচে থাকি,—ওদের মত রাত-দিন জলে ডুবে থাকতে হয় না। এই যে জলের দাসত্ব ছাড়িয়ে জীব ডাঙ্গায় উঠল, এটাই হল জীবনের ক্রমবিকাশের সব চাইতে বড় কথা। এটা যদি না ঘটত তবে পৃথিবীতে আজ যা কিছু দেখছ—মানুষ, পশু-পাখী, পোকা মাকড়, গাছপালা, এ কিছুই থাকত না। এই পরিবর্তনটা যে কিভাবে ঘটল তা বলা কঠিন, তবে মনে হয়, এমনি হয়নি, হয়েছে দায়ে পড়ে। তাই বলছি।

চতুর্থ ধাপ—এ ধাপে প্রথম যারা উঠল, তারা হচ্ছে কচুরীপানা জাতীয় এক প্রকার জলজ উদ্ভিদ্। সমুদ্রের জোয়ার ভাটার সাথে এরা ওঠ-নামা করত। ভাঁটার টানে জল যখন নেমে যেত,—এরা ডাঙ্গায় আট্‌কে শুকিয়ে মরত। এমনি করে কিন্তু বেশী দিন গেল না। বাঁচতে তো সবারই ইচ্ছে করে,—এদেরও করত। তাই জল যখন নেমে যেত, এরা থাকত মাটি কামড়ে। এই করে জল জমিয়ে রাখার মত ব্যবস্থা এদের দেহে আপনি গড়ে উঠল। তখন এদের আর কেবলই জলে ভেসে বেড়াতে হত না। ভিজে মাটি থেকে শিকড় দিয়ে জল শুষে নিত। এই করেই প্রাণী জল ছেড়ে ডাঙ্গায় উঠতে আরম্ভ করল। এ যেন মায়ের কোল ছেড়ে শিশুর প্রথম পদ-চারণা—হাঁটি-হাঁটি পা-পা!

দেখতে দেখতে জলের কোল ঘেঁষে ডাঙ্গা গাছে গাছে ছেয়ে গেল। পোকা-মাকড়ও জল ছেড়ে ডাঙ্গা-মুখো হল। দেহে তাদের ফুস্‌ফুস্‌ জন্মাল, জলের চাইতে বাতাসের উপর বেশী নির্ভর করতে লাগল।

ব্যাঙের জীবনে এ জিনিসটা বেশ ভাল করে দেখতে পাবে।

ব্যাঙ ডিম পাড়ে জলে, ডাঙ্গায় ডিম শুকিয়ে যায় বলে। ঘন লালার মত একটা পদার্থের মধ্যে ডিমগুলি লুকোনো থাকে। কিছু দিন বাদে ডিম ফুটে বাচ্ছা বার হয়,—সবাইর এক একটা লেজ। দেখতে ঠিক মাছের বাচ্ছাদের মত। ওরা তখন ডাঙ্গায় উঠতে পারে না। মাছের মত জলে সাঁতার কেটে বেড়ায়,—ডাঙ্গায় তুল্‌লে আর বাঁচে না। কিছুদিন পরে দেখবে ব্যাঙের বাচ্ছা ব্যাঙাচীর সেই লেজ-ও নেই, আর সে জলে-ও নেই। লেজ-কাটা ব্যাঙাচী তিড়িং-বিড়িং লাফিয়ে বেড়াচ্ছে ডাঙ্গায়। আর চেহারাও এমন পাল্‌টে গেছে যে তাকে চেনাই দায়। এখন একে ধরে বেশ করে জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতো,—দেখবে সে মরে গেছে। দুদিন আগেও যে জল ছেড়ে উঠতে পারত না,—আজ সে জলে ডুবে মরল!

তখনকার পৃথিবীতে যদি জন্মাতে, তবে দেখতে চারদিকে কেবল বন, বন আর বন। সেই বনের মধ্যে মস্ত মস্ত গাছগুলি সব ভূতের মত দাঁড়িয়ে। কোন সাড়া নেই, শব্দ নেই। সেই চুপ্‌-নিঃসাড় বনে রাক্ষুসে

পোকাগুলি, কোনটা পত্ পত্ করে উড়ছে, কোনটা থপ্ থপ্ করে লাফাচ্ছে। হঠাৎ সাঁ সাঁ করে ঝড় ছুটে এলো, ভূতুড়ে গাছগুলি ভয়ে কেঁপে-কেঁপে উঠল,—তারপরে মড়মড় করে ভেঙ্গে-চুড়ে পড়ল। সমুদ্রের জল ফুসে-ফেঁপে, দারুন গর্জনে ডাঙ্গার গায়ে মাথা খুঁড়তে লাগল,—যেন ডাঙ্গাকে আর আস্ত রাখবে না—ভেঙ্গে খান্ খান্ করে গিলে নেবে! ভাবতে পার?

পঞ্চম ধাপ—প্রাণী তো জল ছেড়ে ডাঙ্গায় উঠল। কিন্তু ভরসা করে তখনও বেশী দূর এগুতে পারেনি, থাকত জলের কোল ঘেঁষে। কোন রকম বেকায়দা দেখলেই জলের মধ্যে দিত ঝাঁপ। এ যেন সদ্য-হাঁটতে-শেখা শিশুর হু'পা হেঁটেই মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়া। এ সময়টা কিন্তু বেশী দিন থাকে না, শিশুরও না, প্রাণীরও না। মাথা খাড়া করে শক্ত পায়ে শিশু যেমন ক্রমেই এগিয়ে চলে, তখনকার প্রাণীরাও তেমনি এগিয়ে চল্‌ল—একটা নতুন যুগ দেখা দিল,—সরীসৃপ যুগ।

সরীসৃপ তাদেরই বলে, যারা জলেও থাকে, ডাঙ্গায়ও থাকে। কিন্তু জলের চাইতে ডাঙ্গার দিকেই টান বেশী। আগেকার প্রাণীদের মত এরাও ডিম পাড়ে, তবে জলে নয়, ডাঙ্গায়। এই ডিমের ব্যাপারেই একটা মস্তবড় তফাৎ দেখা দিল এ যুগে,—এদের ডিমের খোলসটা হল বেজায় শক্ত। কাজেই মাছ বা ব্যাঙের ডিমের মত এদের ডিমগুলির ডাঙ্গায় শুকিয়ে মরবার ভয় থাকল না। এক কথায় সরীসৃপ জাতটা সেই পর্যন্ত পৃথিবীর

জীবদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল। জল ছেড়ে ডাঙ্গায় বেঁচে থাকতে হত বলে সেই মত হয়ে উঠল ওদের দেহের গড়ন। তারপরে যতই দিন গেল, ততই তারা উঁচু ডাঙ্গার দিকে এগুতে লাগল।

সাপ, গো সাপ, টিক্‌টিকি, গিরগিটি, কুমীর এরাই ঐ সরীসৃপ জাতের। তবে এখনকার জাত-ভাইদের দেখে তখনকার ওদের যদি আন্দাজ করতে যাও তো বিষম ঠকবে কিন্তু। বিরাট ছিল তাদের দেহ, একশো-দেড়শো ফুট, বা তারও বেশী। তাদের মাথা ছিল খুব ছোট। কারণ, এতটুকু মগজের জন্য বেশী বড় মাথার তো দরকার নেই! পেট ছিল খুব বড়,—কারণ একমাত্র কাজ যাদের শুধু খাওয়া আর খাওয়া, তাদের পেট বড় হবে বৈকি! আর লেজ ছিল যেমনি লম্বা, ঠ্যাং ছিল তেমনি ছোট। কিন্তু এই লেজ ও ঠ্যাং-এ জোর ছিল দারুণ। কতগুলি আবার লেজ আর পেছনের ঠ্যাং-এ ভর করে সোজা খাড়া হয়ে দাঁড়াত। এটা শিখল কিন্তু ওরা দায়ে পড়ে। কারণ, রাত-দিন তো কেবলই খাই, খাই আর খাই। কিন্তু এত খাবার পাবে কোথায়? কাছে পিঠে যা ছিল, সব তো খেয়ে ফর্সা। হঠাৎ চোখে পড়ল, যা খেতে চাইছে তা রয়েছে সেই উঁচু গাছের মগডালে। চল্‌ল চেষ্টা। চেষ্টা করতে করতে তারপরে একদিন সে শিখে গেল দাঁড়াতে। ঐ দেখ, ল্যাজ আর পেছনের ঠ্যাং-এ ভর করে সে সত্তর-আশি হাত উঁচু গাছের ডগা কেমন আরামে চিবুচ্ছে!

ঐ দেখ কেমন আরামে চিবুচ্ছে

আর একটা দল, তারা ছিল খানিকটা নীচু জাতের। দাঁড়িয়ে গাছের ডাল নাগাল পেত না, তাই চেষ্টা চল্‌ল গাছে উঠবার। শিখেও গেল। তারা এ-গাছ থেকে ও-গাছে লাফিয়ে বেড়াত, আজকালকার কাঠবেড়ালীর মত। এই করে চেষ্টা চল্‌ল উড়তে। আস্তে আস্তে তাদের ডানা গজাল, তারা উড়তেও শিখল। কিন্তু তাদের ডানা ঠিক পাখীদের ডানার মত ছিল না ; ছিল বাদুড়ের মত, পাতলা চামড়া দিয়ে আঙ্গুলের মত কয়েকটা হাড় জোড়া দেয়া। দেখতে ছোট হলেও এরা নেহাৎ ছোট ছিল না। একটা শকুনের চাইতেও দশ-বিশ গুণ কিম্বা আরও বেশী বড়। গায়ে এদের পালক ছিল না, ঠোঁট ছিল খুব লম্বা, আর তার মধ্যে ছিল বড় বড় দাঁত। আর ছিল এদের বড় বড় লেজ, গোরুর লেজের চাইতেও লম্বা। এরই একটা দল শেষ পর্যন্ত পাখী হয়ে দাঁড়াল।

ষষ্ঠ ধাপ—শ্বাপদ যুগ। তারপরে আমরা এক নতুন যুগে এসে পড়লাম,—শ্বাপদ যুগ। এই যুগের জন্তু-জানোয়ারগুলি সরীসৃপদের চাইতে এতই আলাদা যে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না, কি করে সরীসৃপদের পরেই এরা এলো! এই দুই যুগের প্রাণীদের মধ্যে স্বভাবে ও চেহারায় এতই তফাৎ, যে মনে হয় নিশ্চয়ই দুই যুগের মধ্যে অন্য কোন প্রাণী পৃথিবীতে এসে গেছে। পাথরের বই-এর সেই ছেঁড়া পাতাগুলি সন্ধান করে বেড়াচ্ছেন বিজ্ঞানীরা,—আজও তাদের খোঁজ মেলেনি। সেই

ভীষণ-চেহারা সরীসৃপগুলি,—চার হাত লম্বা মাটির পোকা, আড়াই হাত টিকটিকি, সাড়ে তিন মণ ওজনের কচ্ছপ, আর আট ইঞ্চি ঠ্যাং-ওলা মাকড়, এরা কিভাবে যে পৃথিবীর বুক থেকে ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, বংশে বাতি দিতেও কাউকে রেখে গেল না, তা ভাবলে অবাক হতে হয়।

বাঘ, ভালুক, হাতী, ঘোড়া, শেয়াল, কুকুর প্রভৃতি জন্তুদের শ্বাপদ বলে। কিন্তু যে যুগের কথা বলছি, সে যুগের শ্বাপদদের চেহারা ছিল আজকের শ্বাপদদের চাইতে ঢের-ঢের বড়। এদের সাথে সরীসৃপদের চেহারা ও স্বভাব যে কতই-না তফাৎ, তা একটু নজর করলেই বুঝতে পারবে।

প্রথমতঃ—এরা পাক্‌কা ডাঙ্গার জানোয়ার। জলের সাথে এদের সম্পর্ক খুব কম।

দ্বিতীয়তঃ—এরা ডিম পাড়ে না। পাড়ে বাচ্চা। আর তারা জন্মেই মায়ের দুধ খায়।

তৃতীয়তঃ—এরা জন্মাল গায়ে লোম নিয়ে। মনে রেখো, জীবদের গায়ে এই প্রথম লোম দেখা দিল, এবং জীবন-ক্রম-বিকাশের ইতিহাসে এটা বড় বড় করে লিখে রাখবার মত কথা। এটা যদি না ঘটত, তবে এরাও হয়তো সরীসৃপদের মত পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে যেত। কারণ, পৃথিবীর মেজাজ তখনও ঠাণ্ডা হয়নি। কখনও হঠাৎ ভীষণ গরম, কখনও বা এমন হাড়মজানো শীত পড়ত যাতে কম্বলের মত মোটা একটা

কিছু গায়ে জড়ানো না থাকলে বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠত। শ্বাপদদের এই লোমের আবরণ তাদের বাঁচিয়ে রাখল, তাই তারা আবরণহীন সরীসৃপদের মত লুপ্ত হয়ে গেল না।

তারপরে শ্বাপদরা তাদের স্বভাবে একটা বৈশিষ্ট্য নিয়ে এলো, যা পৃথিবীর বুকে একেবারেই নতুন—একেবারেই হঠাৎ,—বাৎসল্য। বাৎসল্য মানে, সন্তানের প্রতি স্নেহ-মমতা। টিক্‌টিকি তার বাচ্ছাদের দিকে ফিরেও চায় না, সাপ-ও না, সরীসৃপরা কেউ না। কিন্ত দেখ, গোরু তার বাচ্ছার জন্য কেমন করে। একটু দূরে সরে গেলে হাম্বা-হাম্বা করে ডাকে। কুকুরের কোল থেকে ছানা কেড়ে নিলে সে কেমন কেঁদে মরে। বেড়াল তার বাচ্ছা মুখে নিয়ে কেমন লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়ায়, পাছে তার বাচ্ছা কেউ নিয়ে নেয়! এ থেকে এই বোঝা যায়, ছেলে পুলে নিয়ে ঘর-কন্না গুছিয়ে বসবার ইচ্ছার অঙ্কুর জেগেছে জীব জগতে। যদিও এই ইচ্ছাটা খুব বেশীদিন টেঁকে না, বাচ্ছা বড় হলেই কেউ আর কারুর কথা ভাবে না, হয়তো ভুলে যায়, তবুও জীবনের ক্রম-বিকাশের ইতিহাসে এটা মস্ত বড় কথা। এই থেকেই বুঝতে পারি, জীবদের বুদ্ধিবিকাশ সুরু হয়েছে।

কী করে এই বুদ্ধি, যার আধার হল মন, কোথা থেকে এসে প্রাণের সাথে হাত মেলাল, সে রহস্য আজও অজানা রয়ে গেল।

এর পরের ইতিহাস, প্রাণ-মনের যুগল যাত্রার

ইতিহাস। প্রাণ চলেছে, বুদ্ধি চালিয়ে নিচ্ছে। সে এক সুদীর্ঘ যাত্রার চমকপ্রদ কাহিনী। দেহের অন্তরে মন, আর মনের অন্তরে বুদ্ধি। সাগরের অতল-তলে মুক্তা, আর তার অন্তরে মুক্তা যেন! অতি ধীরে, অতি সন্তর্পণে এগিয়ে নিয়ে চলেছে দেহধারী প্রাণকে। যেন কানে কানে বলছে,—ধীরে চলো,—চলো সাবধানে,—পথ এখনও অনেক,—বিপদ রয়েছে ওৎ পেতে পথের কিনারে কিনারে। ভুল করলে চলবে না,—ক্লান্ত হলে চলবে কেন? পথের শেষ তো ওই দেখা যায়—জয় তোমার অনিবার্য,—ভয় কী? আমি তো আছি!

এই দুস্তর যাত্রা শেষে একদিন প্রাণ এসে দাঁড়াল দেহের হাত ধরে পৃথিবীর বুকে। কী তার রূপ, কী তার ঐশ্বর্য্য, বুদ্ধিতে ঝলোমলো,—মানুষ, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সন্তান।

———

দশ

মানুষের কথা

পৃথিবীতে মানুষ-জন্মের সূচনা হয়েছিল মাত্র তিন লক্ষ বৎসর আগে। মাত্র তিন লক্ষ! মাত্র বৈকি! পৃথিবীর বয়স তো হল প্রায় দুশো' কোটি বৎসর, আর প্রথম প্রাণ এসেছিল প্রায় পঞ্চাশ কোটি বৎসর আগে। কাজেই 'মাত্র' বলব বৈকি!

শ্বাপদ-যুগ আর মানব-যুগের মধ্যে তফাৎ অনেক। পণ্ডিতগণ মনে করেন এই দুই যুগের ইতিহাসের মাঝের দু'-একটা পাতা হয়তো হারিয়ে গেছে। তাই খোঁজ চলেছে সেই হারানো পাতার। অবশ্য ডারউইন নামে মস্তবড় একজন পণ্ডিত বলেছেন যে, মানুষ এসেছে বানর জাতীয় প্রাণী থেকে! অর্থাৎ বানরের ক্রমবিকাশের পরিণতি নাকি মানুষ। এই অনুমানের পেছনে যুক্তিও রয়েছে অনেক। বানরের স্বভাব, চালচলন, হাবভাব যে মানুষের মতো এ কথা অস্বীকার করা যায় না। তবে ওদের সঙ্গে আমাদের মিল থাকলেও গরমিলও কম নয়। কাজেই ডারউইনের মতবাদ বিনা তর্কে গ্রহণ করা চলে না। তবে এ কথা বলা যায়—শ্বপদ যুগের ধারা বয়েই মানুষ উঠে এসেছে। বুদ্ধি-বিকাশ ও বাৎসল্য, যে দুটি অতি ক্ষীণ ভাবে দেখা দিয়েছিল শ্বাপদদের মধ্যে, তারই চরম পরিণতি ঘটেছে মানুষে।

ডারউইন তাঁর মতবাদ প্রচার করলেন ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে, 'The Descent of Man' নামক বইতে। তাঁর মতবাদ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীময় হৈচৈ পড়ে গেল। কেউ বিশ্বাস করলেন তাঁর কথা, কেউ করলেন না। আলোর পূজারীদের ভাগ্যে যা জোটে,—তাঁর ভাগ্যেও জুটল তাই,—অপমান আর নিন্দা। পুরোহিতরা তাঁকে তো একঘরেই করে রাখলেন। যাহোক, ইউরোপের অনেক বিজ্ঞানী লেগে গেলেন ডারউইনের সূত্র ধরে মানুষের পূর্ব-পুরুষদের সন্ধানে।

সে কি কম কথা? প্রথমতঃ, মাটির তলায় ছাড়া তো তাদের আর খোঁজ পাওয়া যাবে না! দ্বিতীয়তঃ, কোন্ দেশের কোন্ মাটির তলায়, কোথায় তারা ঘুমিয়ে আছে, তাও বা জানে কে? তৃতীয়তঃ, সেই পূর্ব-পুরুষরা একে তো সংখ্যায় ছিল খুব কম, তাতে সব মৃতদেহই তো আর ফসিল হয় না, হাজারে, বা তারো বেশীতে মাত্র দু-একটা হয়। কাজেই নানা রকম সমস্যা দেখা দিল। কিন্তু মানুষ তো দমবার নয়! এগিয়ে চল্‌লে তার চেষ্টা।

সেই চেষ্টার ফলে আজ পর্যন্ত বহু ফসিল পাওয়া গেছে পৃথিবীময় নানা দেশে,—নগরে, শহরে, গভীর অরণ্যে, দুর্গম পর্বতে,—জার্মানীতে, ইংলণ্ডে, চীনে, মালয়ে, জাভায়, ভারতেও। আরও কত বেরুবে কে জানে? কিন্তু এত যে পাওয়া গেল, তাতে একখানা পুরো ইতিহাস লেখা আজও সম্ভব হল না। এ যেন বইএর কতগুলি ছেঁড়া পাতা, এলোমেলো ছড়িয়ে আছে। কোনটা আগে, কোনটা পরে, কে বা মধ্যে, তাই নিয়ে লেগেছে মহা ভাবনা। জোড়াতালি দিয়ে হয়তো দাঁড়াল এক রকম। পরেই যে খবর পাওয়া গেল, তাতে উল্‌টে গেল সব। হয়তো পাওয়া গেল একখানা চোয়াল। তারপরে অন্য জায়গায় দুটো দাঁত। আবার অনেক দূরে মাথার একটা খুলি। এখন চোয়াল যার, দাঁত তার কিনা, আবার চোয়াল আর দাঁত যার, খুলির মালিক সে কিনা, তাও-তো দেখতে হবে? কাজেই এই নিয়ে

যাঁরা কাজ করছেন তাদের জ্ঞান, ধৈর্য্য ও শ্রমশীলতা যে কত অসীম, তা ভেবে দেখো। এখন বিজ্ঞানীরা লেগেছেন দু-রকম কাজে,—প্রথম হল, যা পাওয়া গেছে তাকে সাজিয়ে গুছিয়ে তোলা। তারপরে নতুন নতুন ফসিল খুঁজে গরমিল পূরণ করা। এইভাবে চলেছে তাঁদের কাজ। তবে আজ পর্যন্ত যতটুকু জানা গেছে তাতে ডারউইনের মতবাদ যে ঠিক, তা প্রায় প্রমাণ হতে চলেছে; অর্থাৎ পৃথিবীতে মানুষ হঠাৎ আসেনি, এসেছে বানর জাতীয় জীবের ধারা বেয়ে।

আগেই বলেছি যে পৃথিবীর নানা জায়গায় নানা রকম ফসিল পাওয়া গেছে। যা পাওয়া গেছে, তা থেকে এই বোঝা যায় যে তখনকার পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এরা ছড়িয়ে ছিল, এবং সেই সব জায়গার জল-বায়ুর দরুন তাদের চেহারাও হয়েছিল বিভিন্ন। কিন্তু তা সত্বেও বিজ্ঞানীরা সময় অনুসারে এই সব মানুষের শ্রেণী বিভাগ করতে সমর্থ হয়েছেন। সেই কথাই বলছি।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে বানর ও মানুষের মধ্যে আর একটা ধাপ ছিল, যাদের নাম দেওয়া হয়েছে হিডেল্‌বুর্গ মানুষ। চল্‌তি কথায় এদের বলতে পারি 'আধ-মানুষ'। 'হিডেল্‌বুর্গ মানুষ' কিন্তু কোনো বিশেষ জাতের মানুষের নাম নয়। হিডেল্‌বুর্গ হল জার্মাণীর একটা জায়গার নাম। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে সেখানে একটা খনি খুঁড়বার সময় চোয়ালের একখানা ফসিল পাওয়া যায়। অনেক রকম

বিচার করে বিজ্ঞানীরা স্থির করলেন সে এই চোয়ালের মালিক ছিল বনমানুষ আর মানুষের মাঝামাঝি এক রকম জীব ; এবং এরাই হল মানুষের সর্ব-পুরাতন পূর্বপুরুষ। হিডেল্‌বুর্গে চোয়ালটি পাওয়া গিয়েছিল বলে এর নাম দেওয়া হল 'হিডেল্‌বুর্গ মানুষ।'

এরা সংখ্যায় এত কম ছিল, আর শ্বাপদদের ভয়ে এত গভীর অরণ্যে ঘুরে বেড়াত, যে আমাদের জন্য পাথরের গায়ে খুব কম চিহ্নই রেখে গেছে। তবে যে দু'একটা ফসিল পাওয়া গেছে, তা থেকে এদের চেহারা খানিকটা অনুমান করা যেতে পারে।

এই মানুষেরা ঠিক মানুষও ছিল না, ঠিক বানর-ও ছিল না,—ছিল মাঝামাঝি এক রকম। এরা দেখতে ছিল প্রকাণ্ড বড় বানরের মত, তবে লেজ ছিল না, এই যা! এরা গাছে উঠতে পারত না। গায়ে ছিল বড় বড় লোম, আর মুখের মধ্যে ছিল মূলোর মত দাঁত। এদের কপাল ছিল খুব ছোট, পেছন দিকে চাপা, আর মুখের নীচের দিকটা ছিল ঝুলোনো, কিন্তু থুত্‌নি ছিল না একদম। এরা

কিন্তু আমাদেরই মত পায়ে চলে বেড়াত। তবে ঘাড় তুলে মুখ সোজা করে চলতে পারত না। কারণ, এদের ঘাড় ছিল খুব বেঁটে আর মোটা। এরা কথা বলতে পারত না। এরা গভীর জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত। জঙ্গলে

যে সব জায়গায় ভীষণ-চেহারাওলা শ্বাপদরা থাকত, তার ধারও এরা মাড়াত না। কারণ, এরাই ছিল সেই দুনিয়ার সব চাইতে দুর্বল প্রাণী। কতকাল এরা পৃথিবীতে ছিল বলা যায় না। একদিন দেখা গেল এরা সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

যাবে ছাড়া কী? তখনকার পৃথিবীর অবস্থা তো ছিল অতি ভয়ংকর। শুধু বরফ, বরফ, আর বরফ। এই বরফ-ঢাকা পৃথিবীর দারুণ শীতের মধ্যে বেচারাদের বেঁচে থাকতে হত। এখনকার পৃথিবীর মানচিত্র দেখে তখনকার পৃথিবীর চেহারা যে কি ছিল তার কোন ধারণাই করতে পারবে না। ক্রমাগত ভেঙেচুড়ে ফেটে-ফুটে আজ পৃথিবীর চেহারা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং জলবায়ুর এত পরিবর্তন ঘটেছে, যে আমরা যারা আজ পৃথিবীতে বাস করছি, তাদের পক্ষে সেদিনের পৃথিবীর অবস্থা বুঝে ওঠা বড়ই দায়। তবুও বিজ্ঞানীরা অনেক খেটে খুটে তখনকার একটা মোটামুটি ছবি আমাদের জন্য এঁকেছেন।

তাঁরা মনে করেন, আজ যেখানে হিমালয় মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে, সেখানে এক বিশাল সমুদ্র ছিল। টেথিস তার নাম। হিমালয়ের গায়ে কতগুলি সামুদ্রিক জীবের ফসিল পাওয়া গেছে কিনা, তাই থেকে তাঁরা এই অনুমান করেছেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কানসাস নামে একটা জায়গা আছে। সেখানে ১৪ ফুট লম্বা একটা মাছের ফসিল পাওয়া গেছে। তার পেটের মধ্যে

আবার ছ'ফুট একটা মাছের ফসিল। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে এই মাছটার বয়স প্রায় ন' কোটি বছর। কাজেই প্রমাণ হয় যে ন'কোটি বছরেরও আগে থেকে এখানে প্রকাণ্ড একটা সমুদ্র ছিল। সেই সমুদ্র আবার সাত কোটি বছর আগে শুকিয়ে গিয়ে ডাঙ্গা হয়ে গেছে। সেই জায়গাটাই আজকের কানসাস্। আবার দেখ, গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে এমন সব গাছপালার ফসিল পাওয়া গেছে, যা নাকি শীতের দেশ ছাড়া জন্মাতেই পারে না। কাজেই মনে হয় একদিন ওইসব দেশ বরফে ঢাকা ছিল। এখন জল-বায়ু পাল্‌টে গেছে। আবার সাইবেরিয়ার বরফ-ঢাকা অঞ্চলে বিরাট-দেহ এমন সব জন্তুর ফসিল পাওয়া গেছে,—যার মাংস, চামড়া, লোম, রক্ত এমন কি মুখের কচি ঘাস-কটিও নষ্ট হয়নি। কিন্তু বরফের মধ্যে তো ঘাস জন্মায় না। তবে ঘাস এলো কোথা থেকে? মনে হয়, একসময় ঐসব দেশ মোটেই বরফ-ঢাকা ছিল না, কাজেই ঘাসও জন্মাত। তারপরে কোনো দিন, কোনো এক সময়, কিভাবে হঠাৎ নেমে এলো বরফ। আজও রয়েছে সেই বরফ। যে সব জন্তু মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সে সময়, পড়ল তারা চাপা এবং বরফের ঠাণ্ডায় তাদের মৃতদেহ যেমনটি ছিল, বহু-বহু কাল পরে ঠিক তেমনটিই রয়ে গেল। পচেনি বা নষ্টও হয়নি এতটুকু!

আর একটি ঘটনা বলি।

বহু কাল আগে মধ্য-এশিয়ার কোন এক জায়গায়

নল-খাগড়া ঘেরা প্রকাণ্ড এক জলাভূমি ছিল। 'ম্যাষ্টডন্' [Mastodon] নামে বড় বড় লোমওলা হাতীর দল সেখানে চরে বেড়াত। তারপরে হঠাৎ তার জল শুকোতে লাগল। আর তার ফলে নল-খাগড়া চল্‌ল মরে। হাতীরা করে কি? জল যতই পিছোয়, তারা ততই এগোয়। এই করে দল বেঁধে তারা এসে পড়ল কাদার মধ্যে! একে তো কাদা, তায় আবার হাতী! দল বেঁধে তারা ডুবে গেল কাদার মধ্যে। রয়ে গেল চিরদিনের মত সেখানে। এ রকম বহু ম্যাষ্টডনের ফসিল বিজ্ঞানীরা খুঁজে পেয়েছেন সেখানে। পাথরের বই-এর আর একটা পাতা বেড়ে গেল।

কাজেই দেখতে পাচ্ছ, সেদিনের সেই ভীষণ খাম-খেয়ালী পৃথিবীর বুকে কত না কষ্টে বেঁচে ছিল আমাদের সেই প্রথম পূর্বপুরুষ। যেখানটায় শীত ছিল কম, আর ভয় ছিল না বেশী, সেখানেই তারা দল বেঁধে থাকত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিঁকতে পারল না। সম্ভবতঃ কোনো বিরাট দুর্ঘটনায় একদিন তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। পৃথিবীর এই সময়টাকে বলে তুষার যুগ।

প্রায়-মানুষ (Neanderthal Man)—হাজার হাজার বছর কেটে গেল। পৃথিবীতে একদল নতুন মানুষ দেখা দিল। এদের আমরা 'প্রায়-মানুষ' বলব। বিজ্ঞানীর ভাষায় নিয়ান্-

ডারথাল্ ম্যান্। নিয়ান্ডারথাল্ ম্যান্ বলতেও কিন্তু কোন একটা বিশেষ জাতির মানুষ বুঝায় না। জার্মাণীর নিয়ান্ডারথাল্ নামে একটা জায়গায় সর্বপ্রথম এদের কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছিল বলেই এই নাম,—যেমন হিডেল্‌বুর্গ ম্যান্। এদের ফসিল পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে হিডেল্‌বুর্গ মানুষদের পরেই এরা পৃথিবীতে এসেছিল। দেখতে শুনতে এরা আধ-মানুষদের চাইতে খানিকটা ভাল হলেও, আমাদের চাইতে ছিল ঢের খারাপ। এদের গায়েও বড় বড় লোম ছিল। কপাল ও থুত্‌নি আধ-মানুষদের চাইতে একটু উঁচু হলেও আমাদের তুলনায় ঢের থ্যাবড়া! এরা কথা বলতে পারত কিনা জানা যায়নি। কিন্তু বুদ্ধিতে এরা অনেক এগিয়ে গিয়েছিল। এরা মৃতদেহ কবর দিত। জন্তু-জানোয়ারদের ভয়ে এরা লুকিয়ে বেড়াত না! পাথর ঘষে অস্ত্র বানিয়ে লড়াই করত তাদের সঙ্গে। এরা থাকত পাহাড়ের গুহায়, জঙ্গলে নয়। এরাই প্রথম আগুন জ্বালাতে শিখল—পাথরে পাথর ঠুকে। আর দিনের পর দিন সেই আগুন জিইয়ে রাখত গুহার মধ্যে। আগুন দেখলে জন্তুরা ভয় পায় কিনা, তাই। যে সব জন্তু জানোয়ার এরা শিকার করত, তাদের চামড়া শুকিয়ে কাপড়ের কাজ চালাত। আর মাংসগুলি খেত। শুধু মাংস নয়, পোকা-মাকড়, ফল-মূল যা পেত হাতের কাছে, তাই খেত। রান্না করে খেতে তখনও শেখেনি। খেত সব কাঁচা।

তারপরে, এরা ঘর-সংসার গুছিয়ে বসতে স্থুরু করল। সংসারে থাকত একজন পুরুষ আর জনকয়েক নারী। আর থাকত ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা। ঘরে পুরুষই ছিল সর্বেসর্বা, সবাইর দণ্ড-মুণ্ডের বিধাতা! সে যাকে খুশি মারত, যাকে খুশি তাড়িয়ে দিত, আবার যাকে খুশি রাখত। ছেলে বড় হয়ে উঠে হয়তো আলাদা হয়ে যেত, নয়তো বাপকে তাড়িয়ে বা মেরে সংসারের কর্তা হয়ে বসত! দয়া-মায়া, ভক্তি-ভালবাসা কিছুই এদের ছিল না। জোর যার মল্লুক তার, এই ছিল তাদের নীতি! কিন্তু এমনি মারামারি হানাহানি করে তো দিন চলে না। চল্লোওনা। ক্রমেই সংখ্যায় কমতে কমতে একদিন এরাও পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে গেল। প্রায় লক্ষাধিক বৎসর এরা পৃথিবীতে টিঁকে ছিল। এরাই সবাইর প্রথমে পাথরের ব্যবহার স্থুরু করল বলে এই সময়টাকে প্রস্তর-যুগ বলা হয়।

আদি-মানুষ (Palæolithic Man)—এর পরে যারা এলো তাদের বলা হয় প্যালিওলিথিক্ ম্যান। এরাও প্রস্তর-যুগের মানুষ। এদের বলা যাক 'আদি-মানুষ'। আধ-মানুষ আর প্রায়-মানুষদের চেহারাতে যে বানর-ভাব, আর বুদ্ধিতে

যে মোটা-ভাবটা ছিল, এরা তা একদম কাটিয়ে উঠল। চেহারা ও বুদ্ধিতে এরা আধ বা প্রায়-মানুষদের

অনেক উপরে উঠে গিয়েছিল। আজকালকার মানুষ আমরা, এই আদি-মানুষদের থেকে সোজা উঠে এসেছি। কাজেই এই আদি-মানুষরা যে সময়ে পৃথিবীতে বাস করত তাকে আমরা আজকের মানব-সভ্যতার শৈশব বলতে পারি।

এদের আর আমাদের চেহারা ঠিক এক রকম না হলেও আমাদের সঙ্গে এদের মিল অনেক। কপাল, যত্নি ঠিক আমাদের মত না হলেও, অনেকটা উঁচু হয়ে উঠেছিল, আর ঘাড়ও হয়ে উঠেছিল সরু আর লম্বা। এরা মাথায় ছিল প্রায়-মানুষদের চাইতে ঢের উঁচু, আর মুখের ঢং প্রায় মানুষদের মত গোল না হয়ে হয়েছিল লম্বা গোছের। পাথর দিয়ে খুব সুন্দর অস্ত্র এরা বানাতে পারত। বড় বড় জন্তু-জানোয়ারদের সঙ্গে লড়াই করে এরা তাদের মেরে ফেলত। আধ বা প্রায়-মানুষদের মত জন্তুদের আর ভয় করত না। এদের আরও অনেক গুণ ছিল। এরা খব সুন্দর ছবি আঁকতে আর খোদাই করতে পারত। গুহার গায়ে যে সমস্ত ছবি এরা এঁকে রেখে গিয়েছে, এবং হরিণের শিং এর উপরে ও পাথরের গায়ে যেসব সুন্দর মূর্তি খোদাই করে রেখে গিয়েছে তা দেখে প্রশ্ন জাগে,—এরা এ সব শিখল কোথায়? ছুঁচের ব্যবহারও এরা জানত, এবং হাড়ের ছুঁচ দিয়ে কাপড়-চোপড় শেলাই করত।

তবে এও ঠিক, যে অনেক কিছুই এরা তখনও

শিখে উঠতে পারেনি। তার মধ্যে প্রধান হল ঘর-বাড়ি তৈরী। বাসন তৈরী ও রান্নার কাজও এরা জানত না। কাজেই আমাদের তুলনায় এরা অনেক অসভ্য ছিল।
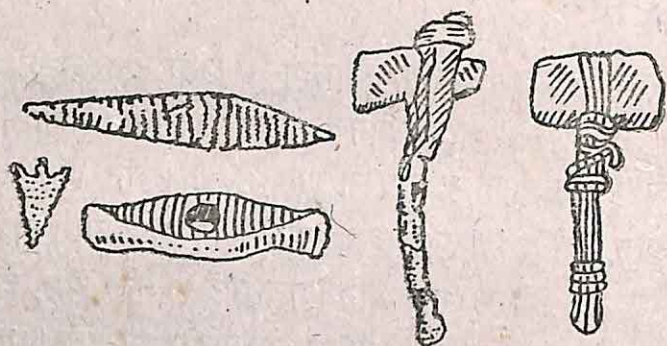
পাথর দিয়ে স্থন্দর অস্ত্র বানাতে পারত

এই মানুষের দল পঁচিশ হাজার বছর পৃথিবীতে প্রভুত্ব করে গিয়েছে। কিন্তু একদিন কোথা থেকে এক দল নতুন মানুষ এসে জুটলো, এবং এদের হটিয়ে দিয়ে প্রভুত্ব কেড়ে নিল। এই নতুন মানুষদের আগমনের সঙ্গে পৃথিবীতে যে যুগ সুরু হল, তাকে বলা হয় নতুন প্রস্তর যুগ। এটা ঘটে ছিল আজ থেকে প্রায় দশ হাজার বছর আগে। লক্ষ্য রেখ, ক্রমশঃই আমরা লাখ লাখ বছরের হিসেব পেছনে রেখে হাজারের কোঠায় এসে পৌঁছচ্ছি। ক্রমশঃই আমাদের হারিয়ে-যাওয়া বহু দূরের পূর্বপুরুষরা আমাদের কাছের মানুষ হয়ে উঠ্ছে।

খাঁটি-মানুষ—(Neolithic Man)—এই নতুনের দলকে 'খাঁটি-মানুষ' বা নেওলেথিক্ ম্যান্ বলব। বুদ্ধি ও চেহারায় এরা আদি-মানুষদের অনেক পেছনে ফেলে এসেছিল। এদের ও আমাদের মধ্যে শুধু সময়ের তফাৎ ছাড়া আর বিশেষ কোন তফাৎ নেই।

ইতিমধ্যে পৃথিবীর অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। পৃথিবী অনেক উষ্ণ হয়ে উঠেছে, এবং তার ফলে বরফ গলতে সুরু করেছে। কাজেই এই নতুন মানুষরা আর এক জায়গায় বসে রইল না,—নানা দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, পৃথিবীর নানা দেশে। বেঁচে থাকবার জন্য চলল তাদের প্রাণপণ চেষ্টা। এইভাবে সভ্যতার যাত্রা সুরু হল পৃথিবীতে। নানাদেশে নানারকম জলবায়ুতে তারা বাস করতে লাগল,—নানা অবস্থার মধ্যে। ফলে এক এক দেশের লোকদের চেহারা, স্বভাব, চালচলন এক এক রকম হয়ে উঠল। এইভাবে এক বহু হল, এক জাতির মানুষ বহু জাতিতে পরিণত হল।

এই মানুষদের চেহারা ছিল সুন্দর, কপাল উঁচু, উঁচু থুত্নি, পাতলা উঁচু নাক, লম্বা সরু ঘাড়। এ ছাড়া, এদের গায়ের লোমও অনেক কমে এসেছিল। এক কথায়, দেহের যে গড়নকে আমরা সুন্দর গড়ন বলি, এদের তা ছিল। অস্ত্র তৈরীর ব্যাপারেও এরা এগিয়ে

গিয়েছিল অনেক, আর এরাই প্রথম গুহা ছেড়ে ঘর-বাড়ি তৈরী করে বসবাস সুরু করল। কখনো কখনো এরা জলা জায়গায় বা হ্রদের উপরে ঘর বানিয়ে বাস করত—বোধ হয় জানোয়ারদের আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য। এ রকম অনেক ঘর-বাড়ির খোঁজ
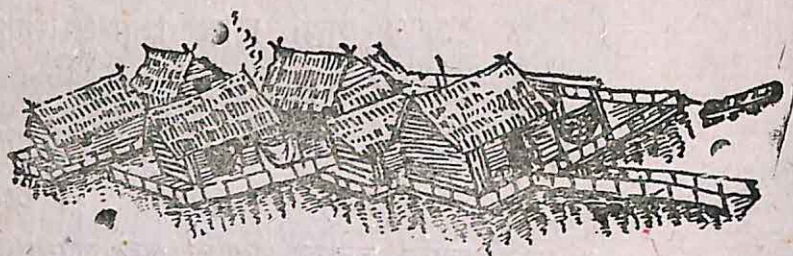
পাওয়া গেছে। শুকনো হ্রদ বা শুক্‌নো জলার তলায় এদের তৈরী অনেক সুন্দর সুন্দর বাসন-পত্র ও অস্ত্র-শস্ত্র পাওয়া গেছে। এক সময় এইসব জায়গায় এই মানুষেরা থাকত। ভূমধ্যসাগরের কাছাকাছি দেশগুলিতে এবং সুইট্‌জারল্যাণ্ডে এখনও এরকম ঘরদোর দেখা যায়।

যতই দিন যেতে লাগল ততই এদের উন্নতি হতে লাগল। এরা শিকার ছেড়ে চাষ-আবাদ ধরল। ক্রমে গোরু, ঘোড়া, কুকুর, এইসব ধরে ধরে পোষ মানিয়ে এরা নিজেদের কাজে লাগাল। লক্ষ্য কর, পশু-নির্বাচন বিষয়েও এরা যথেষ্ট বুদ্ধি-বিবেচনার পরিচয় দিয়েছিল। বাঘ ভালুক-হাতী এইসব ধরে পোষ মানাবার চেষ্টা না করে, এরা নজর দিল গোরু-ঘোড়া-কুকুর প্রভৃতির দিকে। অবশ্য তখনকার গোরু-ঘোড়া-কুকুর তাদের আজকের জাত-ভাইদের মত মোটেই ছিল

না। ছিল অনেক বুনো, অনেক হিংস্র এবং চেহারাও ছিল অন্য রকম। তবুও দেখ, কি করে যেন এই মানুষরা বুঝতে পেরেছিল যে, বনে যত জন্তু আছে তার মধ্যে এরাই শেষ পর্যন্ত মানুষের সবচাইতে বেশী কাজে লাগবে। তাদের বিচারে যে ভুল হয়নি, তা বোধ হয় বুঝতে পাচ্ছো।

খেয়াল রেখ, পৃথিবীতে এই কিন্তু প্রথম চাষ-আবাদ সুরু হল। এর আগে যাদের দেখেছ, তারা তো শুধুই শিকার করত। মানুষ আজ পর্যন্ত যত কিছু আবিষ্কার করেছে, তার মধ্যে চাষ-আবাদই হল শ্রেষ্ঠ। এর ফলে কি হল? এই নতুন মানুষদের আর দিন-ভোর শিকারের খোঁজে বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াতে হল না। চাষের ফসল ঘরে তুলে ধীরে সুস্থে নিঃশ্চিন্তে বসে খাবার সুযোগ পেল। জীবনের বিপদ ও ঝুঁকি কমে গেল। কারণ, শিকারে গিয়ে জন্তু-জানোয়ারদের হাতে তো অনেকেরই প্রাণ যেত। এইভাবে তাদের জীবনে অবসর ও বিশ্রাম এলো। দেহের কাজ কমল বটে, কিন্তু মাথার কাজ সুরু হল। তারা নানাদিকে বুদ্ধি ও মাথা খাটাতে লাগল। তারা জীবনকে আরও সহজ, আরও সুন্দর করে গড়ে তুলবার সাধনায় লেগে গেল।

গোরুর দুধও এরা খেত, কাঁচা-পচা কিছুই খেত না। এরা রান্না করতে জানত। গাছের ছালে কাপড় বানিয়ে তাই এরা পরত।

ধীরে ধীরে ধাতুর ব্যবহারও এরা শিখে ফেল্‌ল।

বন-বাদাড়ে, পাহাড়-পর্বতে ঘুরে ঘুরে হঠাৎ একদিন সোনা আবিষ্কার করে ফেল্‌ল। সোনার রূপ দেখে তারা আমাদের মতোই মুগ্ধ হয়েছিল, হয়তো হয়েছিল আরো বেশী। ক্রমে সোনা গালিয়ে পছন্দসই গয়না বানানোর বিদ্যেটাও এরা শিখে ফেলল। আবিষ্কারের নেশা এদের আরও এগিয়ে নিয়ে চল্‌ল। একটার পরে একটা নতুন ধাতু এরা খুঁজে বের করতে লাগল। শুধু খুঁজে বের করেই থামল না, তাদের ব্যবহারও শিখে ফেল্‌ল। অবাক্ হয়ে যেতে হয়, যখন দেখি সেই দশ হাজার বছর আগে এরা তামা ও টিন মিশিয়ে কাঁসা বানিয়ে ফেল্‌ল, আর তা দিয়ে তৈরী করল তাদের যুদ্ধের অস্ত্র! এইভাবে মানুষ প্রথম ধাতুর ব্যবহার শিখল। ধাতু আমাদের কি কাজে লাগে তা তোমরা নিশ্চয়ই জান। এমন খুব কম ব্যবহারের জিনিসই আছে যাতে কোন না-কোন ভাবে ধাতুর দরকার হয় না। এই ধাতুর ব্যবহারই মানব সভ্যতাকে আজ এতদূর এগিয়ে এনেছে।

খাঁটী মানুষেরা পূজা-অর্চনাও করত। যত সব অদ্ভুত ও কিম্ভূত চেহারার পুতুল ছিল এদের উপাস্য। মোট কথা, ভয় আর বিস্ময় থেকেই প্রথম ভক্তি জন্মাল মানুষের মনে। যখন সে দেখল, অস্ত্র দিয়ে জানোয়ার মারা যায়, কিন্ত ঝড় যখন আসে আকাশ ভেঙে, বাজ যখন ফেটে পড়ে পাঁজর কাঁপিয়ে, বান যখন ছুটে আসে দুকূল ছাপিয়ে, তাকে তো ঠেকানো যায় না। পারা যায়

না তো সূর্যের আলোকে কমিয়ে দিতে, বা চাঁদের আলোকে বাড়িয়ে দিতে। তখনই তার আদিম মনে জেগে উঠল ভয়। এ ভয় গুহার মুখে হাতী-দেখা ভয় নয়। এই ভয়ের পেছনে সে কল্পনা করল এমন এক শত্রু, যাকে কাবু করা যায় না তার অস্ত্র দিয়ে। কারণ, সে শত্রু তো তার নাগালের বাইরে; দেখা যায় না, ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না। তখনই আদিম-মানুষ এই অদৃশ্য শত্রু বা শক্তির কাছে হার মানল, আর মাথা নোয়াল। নানা রূপে তাকে কল্পনা করে, নানা ভাবে তুষ্ট করতে চাইল। সে চেষ্টার আজও কি শেষ আছে? তাইতো আজও মানুষ বলছে,—'রুদ্র যত্তে দক্ষিণমুখং তেন মাং পাহি নিত্যং'—হে রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ তা দিয়ে আমায় রক্ষা করো! এই হল মানুষের ধর্ম-বিশ্বাসের গোড়ার কথা, পূজা-প্রণালীরও বটে। সে অনেক কথা, যত বড় হবে, ততই বুঝবে,—এখন থাক।

এমনি করে কত না আপদ-বিপদ, ঝড়-ঝঞ্চা, দুঃখ-সুখ, হাসি-কান্নার ভেতর দিয়ে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর কেটে গেলে। মানুষের বুদ্ধি ক্রমেই এগিয়ে চল্‌ল। আজ মানুষের বুদ্ধির কাছে 'অসম্ভব' বলে কিছুই নেই। সে চাঁদের বুকে তার পায়ের ছাপ রেখে এসেছে, সেখানকার নুড়ি কুড়িয়ে এনেছে, শুক্র ও মঙ্গল গ্রহে বেতারযন্ত্র পাঠিয়েছে, সেখান থেকে তারা গ্রহ-নক্ষত্রের নাড়ি-নক্ষত্রের খবর পাঠাচ্ছে পৃথিবীতে অবিরত;

ভীষণ সমুদ্রে ডুবে মণি-মুক্তা তুলে আনছে, জ্ঞানের খোঁজে আগ্নেয়গিরির গর্ভে নামছে। আজ সে মৃতকেও প্রাণ দেবে বলে স্পর্ধায় বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষের বুদ্ধির জয়যাত্রা আর কত দূর এগুবে, কে জানে ?

এই যুগের শেষের দিকে পৃথিবীতে এমন একটা ভয়ংকর ঘটনা ঘটেছিলো যার তুলনা পাওয়া ভার। আজ যেখানে ভূমধ্যসাগর ও লোহিতসাগর দেখছ, সেখানে নাকি আগে কোন সমুদ্রই ছিল না। ওখানটায় ছিল কতগুলো হ্রদ। এবং সেই হ্রদের উপরে বহুলোক বসবাস করত। তারপরে হঠাৎ একদিন পৃথিবী উঠল কেঁপে। ফেটে ফুটে চৌচির হয়ে ইউরোপ আর আফ্রিকার সংযোগ স্থল, যাকে আমরা এখন জিব্রালটার বলি, সেখানটা গেল উড়ে। আর যেই না উড়ে যাওয়া, অমনি আটলান্টিক মহাসমুদ্রের জল এসে হু-হু করে ঢুকে পড়ল তার মধ্যে। কি ভয়ঙ্কর কাণ্ডটাই না ঘটল! কত লোক যে মারা গেল, কত লোক যে ভেসে গেল জলে, ভাবলেও যে গায়ে দেবে কাঁটা! এই ভাবেই নাকি সৃষ্টি হয়েছিল ভূমধ্যসাগর আর লোহিতসাগর। বিস্মৃতযুগের সেই নিদারুণ বিপর্যয় মানুষের মনকে এমনই নাড়া দিয়েছিল, যে যুগ যুগ ধরে এই কাহিনী মানুষের মুখে মুখে চলে চলে, অবশেষে স্থান পেল হিন্দুশাস্ত্রে, এবং তারও অনেক পরে, য়িহুদি ও খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ, বাইবেলে। বাইবেলের নোয়ার নৌকার গল্প তোমরা বোধ হয় অনেকে পড়েছ। সেটা এই মহাপ্রলয়েরই কাহিনী।

———

এগার

শেষের কথা

আমার কথাটি ফুরোলো, নটে গাছটি তবু মুড়োলো না তো !

আর একটু শোনো,—একটু—কেমন ?

লঙ্কার রাজা রাবণের নাকি সাধ হয়েছিল স্বর্গে উঠবার সিঁড়ি বানাবেন। এমন সাধ যে কেন হয়েছিল, জানা যায় নি। তবে সাধ হয়েছিল।

রাজা মানুষ, চট্ করে কি কিছু হয় ? কুঁড়েমি, ঢিলেমি, এই নানা সাত-পাঁচ করতে করতে শেষটায় রামের সঙ্গে লেগে গেল যুদ্ধ। আর সেই যুদ্ধেই অকালে তার প্রাণটি গেল। সিঁড়ির মনে সিঁড়ি পড়ে রইল,—তা আর হয়ে উঠল না।

গল্পের রাবণ যা করে উঠতে পারেন নি, তা কিন্তু অবশেষে রূপ পেতে চলেছে একদল মানুষের হাতে। রাবণের সাথে তাঁদের সম্পর্কটা কি জানিনে, কিন্তু কল্পনা জগতে তাঁরা তাঁর সগোত্র। তাঁরা বিজ্ঞানী।

আদিম মানুষের সবচাইতে বেশী ভয় ও বিস্ময়ের বস্তু ছিল আকাশ, তা তোমরা শুনেছ। এই আকাশের দিকে তাকিয়ে, তার বিচিত্র রূপ দেখে তাদের আদিম মনে কত না কল্পনার ছবি, কত প্রশ্ন, কত না জিজ্ঞাসা জেগে উঠত। সেই দিন থেকে সুরু হয়ে ছিল মানুষের

স্বর্গের সিঁড়ি রচনা—আকাশ জয়ের সাধনা। তা আজও চলেছে। আজকের মানুষ বার বার চাঁদে গিয়ে তার খবর জোগাড় করেছে, চাঁদের নুড়ি পাথর কুড়িয়ে থলে ভরে নিয়ে ফিরে এসেছে পৃথিবীতে, শুক্র ও মঙ্গল গ্রহে তার বৈজ্ঞানিক যন্ত্র পাঠিয়েছে। সেখান থেকে অবিরত খবর আসছে পৃথিবীতে। এসব খবর তো তোমরা রাখো। বস্তুতঃ আকাশের দিকে তাকিয়ে মানুষের মনে যে আদিম প্রশ্ন একদিন জেগেছিল, তা থেকেই সুরু হয় মানুষের সকল রকম জ্ঞানের সাধনা। বিজ্ঞান-চর্চ্চার মূলও ওখানে। আকাশ আজ পৃথিবীর বড়ো কাছে এসে পড়েছে। স্বর্গের সিঁড়ি মাথা উঁচিয়েই চলেছে। স্বর্গ প্রায় ধর ধর।

তোমরা দেখেছ, পরমাণুতে গড়া এই বিশ্ব-সংসার কিরকম একটা নিয়ম-শৃঙ্খলে বাঁধা; আকাশের নীহারিকা থেকে পৃথিবীর ধূলিকণা পর্যন্ত। এই বাঁধন কেটে ছুটে বেরয় সাধ্য কার? আবার সব জিনিসেরই মূল উপাদান এক। কিন্তু এক হওয়া সত্বেও বিশ্বময় কত না বৈচিত্র, কত না বিভিন্নতা! কোন দু'টি জিনিস ঠিক একই রকম, এ তুমি কিছুতেই দেখাতে পারবে না,—না দু'টি তারা, না দু'টি গ্রহ, না দু'টি গাছ, না একই গাছের দু'টি ফুল বা ফল, না একই পিতা-মাতার দু'টি সন্তান; কিছু না কিছু বিভিন্নতা থাকবেই থাকবে। এটাই হল সৃষ্টির পরম বিস্ময়! অথচ দেখ, সব কথার শেষ কথা হল, ঐ অতিপরমাণু দিয়ে গড়া

গুটি কয়েক পরমাণু, দশ-কোটির ঠাসাঠাসিতে যার এক ইঞ্চির পরিমাপ মাত্র !

সৃষ্টির প্রথম দিকে আমরা দেখেছিলাম বিশ্বময় শুধু একটি মাত্র বস্তুর প্রকাশ। সে হল তেজ বা জ্যোতি। বলা যাক, মহাজ্যোতি বা আদি-জ্যোতি, কারখানার সর্বপ্রথম বস্তু যেমন চুলোর আগুন। সেই মহাজ্যোতিই কালক্রমে রূপ পেল তেজোগর্ভ ঘূর্ণমান নীহারিকায়। কতকাল জানিনে, করণ, সে 'কাল' মানুষের হিসাব মানে না, চলেছিল এই পুঞ্জীভূত জ্যোতির মহাখেলা অনন্ত আকাশে। তারপরে, একদিন কবে ছিট্‌কে বেরুল তার ভেতর থেকে খণ্ড খণ্ড তেজ-স্তূপ নক্ষত্রের রূপ নিয়ে। তেজের কি লেলিহান দাবানল জেগে উঠেছিল সেই দিন আকাশের বুকে।

তারপরে এলো গ্রহ,—নক্ষত্রের দেহ-খসা সন্তানের দল। সেই দিন কে জানত, নক্ষত্রের অতি ক্ষুদ্র একটি ভগ্নাংশ একদা কী এক পরমাশ্চর্য উপায়ে রূপ-রস-গন্ধে ভরা এমন সুন্দর পৃথিবী হয়ে দাঁড়াবে ?

আদি-জ্যোতি কি এই পরিণতির প্রতীক্ষায়ই দিন গুণছিল ?

আকাশের তপস্যায় জন্ম পেল যে পৃথিবী, এইবার সুরু হল তার নিজের সার্থক হওয়ার যাত্রা।

দিন, মাস, বছর নয়। কোটি কোটি বছর ছিল এই যাত্রা পথের বিস্তৃতি। কী দাপাদাপি, কী মাথা কোটাকুটি, কী নিদারুণ ভাঙ্গা-গড়া সেই যাত্রাপথ আচ্ছন্ন

করে রেখেছিল, তাতো দেখেছ। বোবার কান্নার মতোই ছিল তার অন্তরের আক্ষেপ।

তারপরে, ধীরে ধীরে সে-যেন প্রকাশের ভাষা খুঁজে পেলো, স্তব্ধ হয়ে এলো তার দাপাদাপি, শান্ত হয়ে এলো তার মেজাজ ; এলো এক মহাজন্মের লগ্ন,—প্রথম প্রাণ জন্ম নিল পৃথিবীতে। জড় রূপ পেল প্রাণে।

লক্ষ্য কর, সৃষ্টির খেলা-ঘরে এযাবৎ যারা আসর জমিয়েছিল, তারা কিন্তু সবই ছিল প্রাণহীন, জড়। কি করে এই জড়-বিশ্বে, লেশ মাত্র আভাষ না দিয়ে, ছোট্ট একটি প্রাণ এসে দানা বাঁধল সে জিজ্ঞাসার আজও উত্তর মেলেনি। তবে সৃষ্টির আদিতে জ্যোতির যে মহাখেলা আমরা দেখেছি—সেই জ্যোতিরই রূপান্তর ঘটেছে প্রাণে, এ কথা যদি মেনে নেই, তবে সব প্রশ্নই চুকে যায়।

দেহে একটি মাত্র কোষ সম্বল করে জড়ের এই পরমাশ্চর্য মহাপরিণতি, নবীন প্রাণের প্রথম অঙ্কুর তার যাত্রা সুরু করল পৃথিবীতে। সে কি নিদারুণ নিঃসঙ্গ অভিযান! সেই মহাদুরন্ত পৃথিবীর বুকে মহাক্ষুদ্র একটি প্রাণ, কী করে যে টিঁকে রইল তা ভাবা যায় না। শুধু কী টেঁকা? বংশ বৃদ্ধির জন্য সে কী তার আকুল চেষ্টা! দেহের মাঝখান দিয়ে সরু হতে হতে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে বহু-গুণিত হয়ে চল্‌ল সে। এক কোষধারী প্রাণী বহু কোষধারী হয়ে উঠল। যা ছিল সহজ সরল, তা হয়ে উঠল বিচিত্র, জটিল।

প্রাণের জয়-যাত্রা সুরু হল পৃথিবীর বুকে। এ যাত্রা অমরত্বের যাত্রা। সন্তানের মধ্যে অমর হয়ে থাকতে চাইল সে!

সেই যে সুরু হল, আজও তা থামেনি, একটানা বয়ে চলেছে স্রোতের মত। বিচিত্র হতে বিচিত্রতর হয়ে উঠেছে তার রূপ। কত শাখায়, কত প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে, প্রসারিত হয়ে, বিস্তৃত হয়ে সেই ধারা বয়ে চলেছে অভিব্যক্তির পথে, কোন্ মহাসমুদ্রের দিকে, —কে জানে?

কিন্তু প্রাণের এই যে বিকাশ, এ তো এমনি হয়নি, লক্ষ লক্ষ বছর তাকে সাধনা করতে হয়েছে। বেঁচে থাকবার জন্য প্রকৃতির বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে এই যে প্রতিমহূর্তে মরণপণ যুদ্ধ, এতেই সংহত হয়েছে তার শক্তি, ফুটে উঠেছে তার বুদ্ধি, আর এই বুদ্ধির চরম বিকাশেই তো সে আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব,—মানুষ।

জলের উদ্ভিদ্ যে দিন ডাঙ্গায় আটকে হাঁস-ফাঁস করে উঠেছিল, সে দিন হয়তো বেঁচে থাকবার ইচ্ছা জেগেছিল তার মধ্যে। তারই ফলে ক্রমে তার দেহের গড়ন ডাঙ্গার উপযোগী হয়ে উঠ্‌লো।

ক্রমে ডাঙ্গার পথ বেয়ে প্রাণ এগিয়ে চল্‌ল,—জল রইল পেছনে পড়ে। এইভাবেই জল ছেড়ে সরীসৃপ দল ডাঙ্গায় উঠ্‌লো।

তারপর এলো শ্বাপদ, মাঝে মাঝে জল খাওয়া ছাড়া জলের উপর নির্ভর তারা মোটেই করে না। ভীষণ গরম

আর ভীষণ শীতের মধ্যে তাদের বেঁচে থাকতে হত। তাদের গায়ে বড় বড় লোম জন্মাল। সবাইর প্রথমে তারাই সন্তানের প্রতি ভালবাসা দেখাল, আর সংসার গোছাবার দরকার বোধ করল। এই যে দুটি বৃহৎ ইচ্ছা অতি সামান্য ভাবে শ্বাপদদের মনে জেগেছিল, তাই যুগে যুগে বিকাশ পেয়ে অতি নিপুণভাবে পূর্ণতা পেলো মানুষের মধ্যে। যে আধ-মানুষ বন্য জন্তুর ভয়ে গভীর বনে লুকিয়ে বেড়াত, গুহায় থাকতেও সাহস পেত না, সেই মানুষই আজকের মানুষে পরিণত হয়ে বুদ্ধির জোরে গোটা পৃথিবী ভোগ করছে।

কিন্তু করলে কি হবে ? এই মানুষই পায়ে ভর করে, মাথা খাড়া করে চলতে পারেনি বহুকাল। মাথা বুক নত করে, মাটির কাছে কত না মার্জনা ভিক্ষা করে, সর্ব-দুর্বল মানুষ, কত না ভয়ে পৃথিবীর এক কোণে সামান্য একটু স্থান করে নিয়েছিল।

তারপরে, কি করে কি হয়ে গেল! নুয়ে-পড়া তার মাথা সে আকাশের দিকে উঁচিয়ে ধরল,—শিরদাঁড়া তার খাড়া, সোজা হয়ে উঠল,—শুধু পায়ে ভর করে সে চলতে সুরু করল। হাত দুখানা চলার কাজ থেকে মুক্তি পেল। হাতের এই অবসর মানুষের অভিব্যক্তির ইতিহাসে মস্ত বড় একটা ঘটনা। মুক্তি পেয়ে হাত তার কাজ সুরু করল,—ধরতে, ছুঁতে, খেতে, শিকার করতে। একটা আমূল পরিবর্তন এসে গেল মানুষের ইতিহাসে। হাতের সঙ্গে মাথার

সম্পর্ক নাকি খুব নিবিড়, এমন কথা বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন। ধরা-ছোঁয়ার ভেতর দিয়েই শিশুর বুদ্ধি বিকাশ পায়। দেখনা, শিশু শুধু দেখেই খুশী নয়, সব কিছু ধরতে চায়, ছুঁতে চায়, আকাশের চাঁদ পর্যন্ত! আদিম মানুষেরও হল তাই। এই ধরা-ছোঁয়ার ভেতর দিয়েই তার বুদ্ধি বিকাশ পেয়ে চল্‌ল। আত্মরক্ষার কাজে, আহার সংগ্রহের কাজে সে আরো উপযুক্ত হয়ে উঠতে লাগল,—আর তার সাথে বেড়ে চল্‌ল তার ইচ্ছাশক্তি।

কাজেই দেখ, বুদ্ধি আর ইচ্ছাশক্তির ক্রম-বৃদ্ধিই হল অভিব্যক্তি গল্পের মূল কথা। ইচ্ছাশক্তিই হল সব চাইতে বড় শক্তি। সব কিছু তার কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য। মহাবীর নেপোলিয়ন বলতেন—'অসম্ভব' বলে কোন কথা আছে তা তাঁর জানা নেই। কাজেই মানুষের বুদ্ধি যতই শুভ হবে, ইচ্ছার শক্তি ততই বাড়বে,—মানুষ ততই উন্নতির পথে এগিয়ে চলবে।

কিন্তু যে দিকটায় তুমি ইচ্ছার জোর কমিয়ে দেবে, অবজ্ঞা করবে, হেলা করবে, সে দিকটা আস্তে আস্তে অকেজো হয়ে পড়বে; তারপরে, প্রয়োজন নেই বলে ক্রমে সে লোপ পেয়ে যাবে। ধর, যেমন জলের মাছ, আর ডাঙ্গার প্রাণী। শ্বাস নিতে হয় দুজনকেই। কিন্তু ডাঙ্গায় তুল্‌লে প্রায় মাছই বাঁচে না, আবার জলে চুবোলে আমরা মরি। শ্বাস নেওয়ার যন্ত্র হল ফুস্‌ফুস্। মাছের ফুস্‌ফুস্ নেই। সে শ্বাস নেয় ফুল্‌কো দিয়ে।

জল ছেড়ে প্রাণী যখন প্রথম ডাঙ্গায় উঠতে সুরু করেছিল, ফুল্‌কো দিয়ে তখন কোন কাজ হল না। ডাঙ্গার আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাওয়াবার চেষ্টা করতে করতে শেষে প্রাণী-দেহে ফুস্‌ফুস্‌ গড়ে উঠলো। ওদিকে দেখ, প্রথম দিকে মানুষের ছিল মূলোর মত দাঁত, আর গা-ভরা লোম। সে সময় সে যা খেত তাতে অতো বড় দাঁত দরকার ছিল,—আর পৃথিবীর পাগলা আবহাওয়ায় বেঁচে থাকবার জন্য প্রয়োজন ছিল ঐ লোমের কম্বল। কিন্ত দুটো প্রয়োজনই এখন মিটে গেছে,—তাই সেই মূলো-দাঁতও নেই, লোমের কম্বলও নেই।

আরো পেছনে যাও ডারউইনের সূত্র ধরে। আমাদের আদি-পিতার সেই ল্যাজ? সেও ঘুচেছে অনাবশ্যকতার তাগিদে।

মানুষের দেহের মধ্যে এমন অনেক যন্ত্র নাকি এখনো আছে, যার কোন কাজ নেই। বিবর্তনের সাক্ষী বয়ে এখনো তারা টিঁকে আছে।

পায়ের কাজ আজকাল আমাদের বড়ো কমে গেছে —পায়ে পায়ে যান,—পায়ে পায়ে বাহন। হাঁটা-চলা নেই একরকম বলা যায়। কিন্ত দিন ছিল, যখন পা-ই ছিল একমাত্র যান, এবং একমাত্র বাহন। দূর-দূরান্ত, দেশ-দেশান্তর মানুষ পায়ে-হেঁটে বেড়াত। এমনি কত প্রসিদ্ধ পরিক্রমণ ও পরিব্রজনের সংবাদ ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের তিব্বত ভ্রমণ, ফাহিয়াণ, হুয়েনচাং-এর ভারত ভ্রমণ, এমনি আরো

কতো। কিন্তু আজ মানুষ পা'কে বড় অনাদর করছে। কি জানি, প্রকৃতির নিয়মে সে কোন দিন পা-হারা না হয়ে যায়!

লক্ষ্য কর, ধাপে ধাপে মানুষ যতই এগিয়েছে, ততই তার চেহারাও উন্নত হয়েছে। এটা কিন্তু অমনি হয়নি,

হয়েছে তার বুদ্ধি আর ইচ্ছা-শক্তি বিকাশের সাথে সাথে। যতই তার বুদ্ধি খুলতে লাগল, ততই তার চেহারার বানর-ভাবটাও কেটে যেতে লাগল। তার নীচু কপাল ও থুত্নি উঁচু হল, চ্যাপ্টা, ভোতা নাক টিকালো হল, খাটো-মোটা ঘাড় সরু ও লম্বা হল, হাত-পা ও মাথা দেহের সাথে তাল রেখে গড়ে উঠল।

এক কথায় শিল্পী যেন তাঁর তৈরী পুতুলে অতি নিপুণভাবে শেষ আঁচড়টি দিয়ে ছেড়ে দিলেন।

নটে গাছটি মুড়োল।